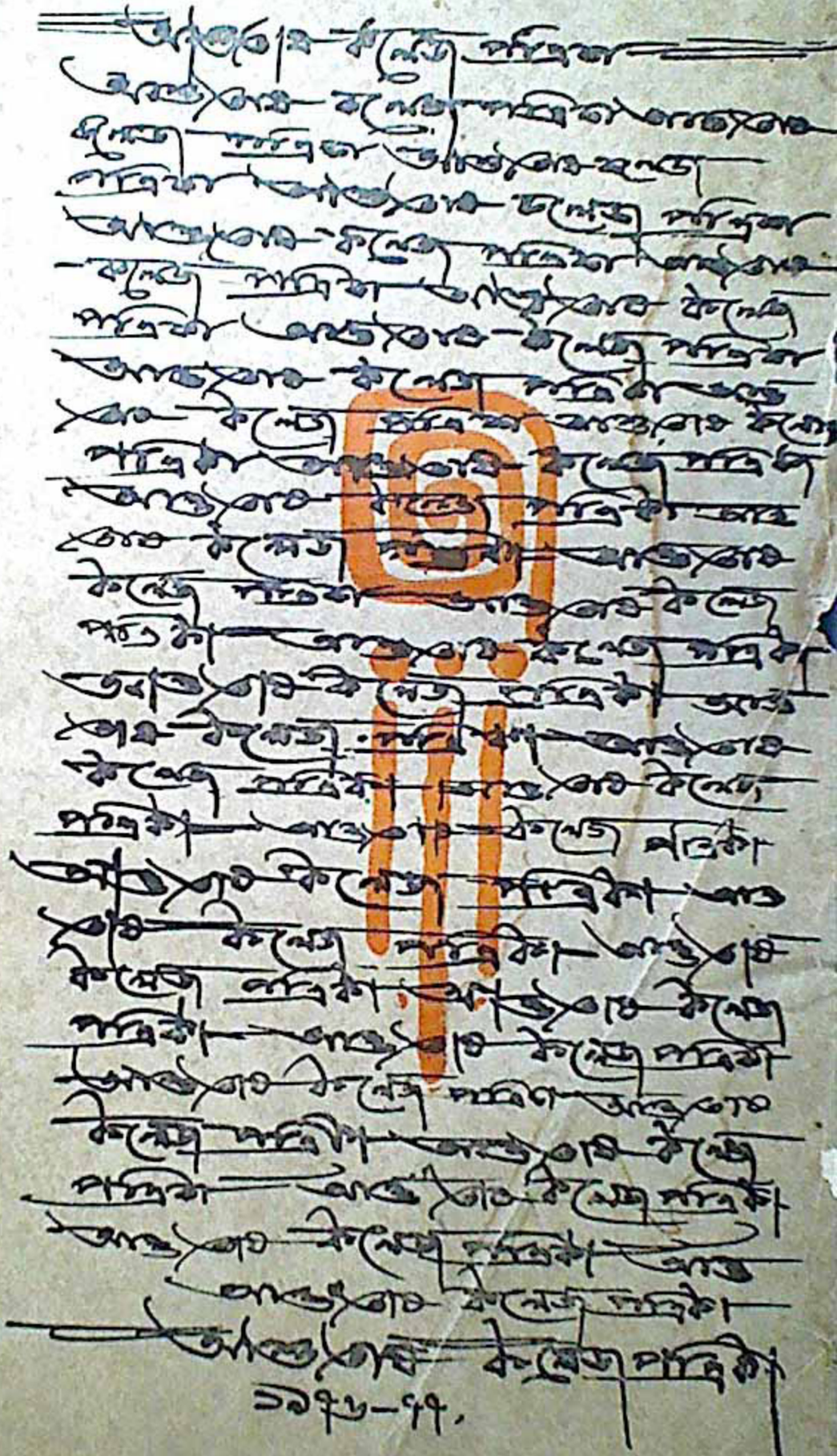

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

সম্পাদনা :

অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্র নাথ দত্ত ।

অধ্যাপক শ্রীউদয়ভানু ভট্টাচার্য ।

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ।

অধ্যাপক শ্রীঅজয় কুমার সেন ।

ছাত্র সম্পাদক সোমনাথ বসু ।

১৯৭৬-৭৭

পরলোকে স্বদেশ-প্রেমিক অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দে

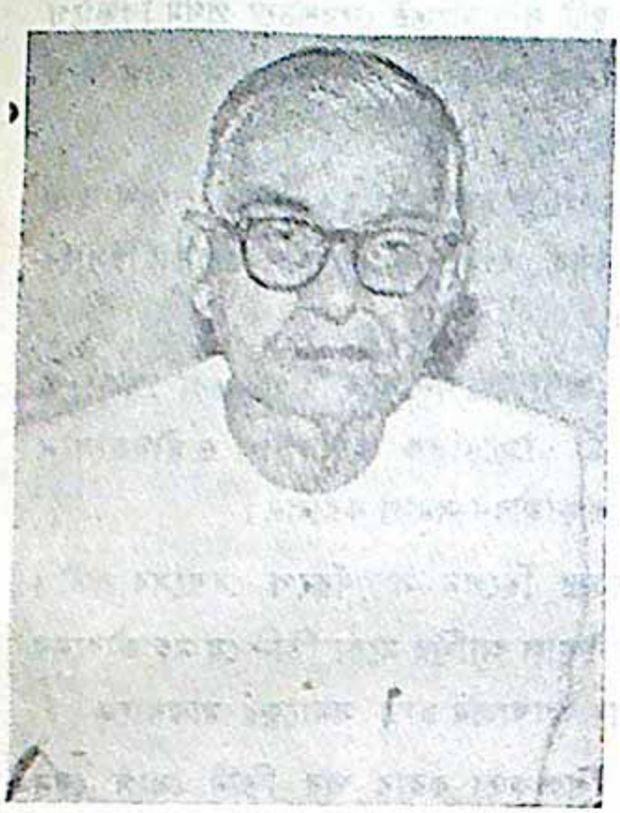

"প্রথমেই অধ্যাপক সুরেশ দে মহাশয়ের কথা বলা উচিত। তিনি তাঁর অমূল্য উপদেশে, সাহায্যে, আন্তরিকতায় আমাদের আন্তরিকতার বোঝা দিন দিন বাড়িয়েই চলেছেন। তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে আমার পত্রিকা প্রকাশনাই সম্ভব হত না"।

পরলোকগত সর্বজনপ্রিয় সর্বত্যাগী দেশসেবক আমাদের সেই প্রাজ্ঞ অধ্যাপক (ইংরাজী ভাষা সাহিত্য বিভাগ) সুরেশ চন্দ্র সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেছিলেন তদানীন্তন কলেজ পত্রিকা সম্পাদক তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে (১৯৫৯)।

১৯৫৭ সাল থেকে বছর তিনেক সুরেশবাবু আশুতোষ কলেজ পত্রিকা অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৭৮এর ২২শে মে মাসে তাঁর পরলোক গমনের সংবাদ পেয়ে আমরা মর্মাহত শুধু নয়, স্মরণ করেছিলাম একদা এই কলেজের এক মহানপ্রাণ পুরুষকে। কলেজে তখন গ্রীষ্মবকাশ খোলার পর প্রবীন অধ্যাপকরা তাঁর কথা আলোচনা করতে আমার মনে পড়ল আমি এই কলেজে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তাঁর ছাত্র ছিলাম। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ নীরোদবাবু গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যেই অবসর নিয়েছিলেন।

নানা অসুবিধায় আমরা সুরেশবাবুর একটি শোক জ্ঞাপক শ্রদ্ধাঞ্জলির সমাবেশের আয়োজন কলেজে করতে পারিনি। আমি এই বিদ্যায়তনের সমস্ত শিক্ষক ছাত্র কর্মীর পক্ষ থেকে এ গভীর লজ্জার কথা সসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে স্বর্গত সুরেশবাবুর অবিনশ্বর আত্মার শান্তি কামনায় আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ও তাঁর আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে এ মর্মবেদনা ও সহানুভূতি প্রেরণ করছি।

চক্রবেড়িয়া রোডের মোরে ঘোষ জুয়েলারীর ওপর সেই জীর্ণ প্রাচীন মেস বাড়ীর তিন তলায় থাকতেন অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দে। ঐ বাড়ীতেই এক সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, (ইংরাজী) প্রখ্যাত ছন্দোবিদ্—তিনিও থাকতেন। এখনও সুরেশবাবুর আত্মীয়রা থাকেন। শ্রীমণি দে মহাশয় আমাদের জন্য সুরেশবাবু সংক্রান্ত কিছু তথ্য ইংরেজীর অধ্যাপক দেবকুমারবাবু ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ নীরোদবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি সেগুলি সংগ্রহ করে ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাশয় এবং

করেছিলাম . হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, দক্ষিণ-পশ্চিমে
গোবিন্দপুরের বিশাল দেবদারু বৃক্ষ দুটির উন্নত শির
স্পর্শ করে ইচ্ছামতী সৈকতের কলাকোপা, সমসাবাদ
ও হরিশকুলের শ্যাম বিটপী শ্রেণীর উপর দিয়ে মায়ের
নীলাভ অঞ্চলখানি এবং তাঁর ছায়াসম কেশরাশি
ত্রস্তায়ে পড়েছে।
"আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বাংলার সেই
চিরন্তনী মায়ের চরণ কমলে নবাবগঞ্জের এই ক্ষুদ্র
কাহিনীটি নিবেদন করছি।"

কৌতূহলী পাঠক ৭৩ পাতার এই গ্রন্থ থেকে, আজ দুর্লভ, একদা প্রোজ্জ্বল দেশপ্রেমের যৌবচেতনার এক মূল্যবান তথ্য-চিত্র লাভ করবেন।

"ওগো মা তোমার কী মূরতি
আজি দেখি রে—"

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে—
অধ্যাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

জাতি ভেদের সব চেয়ে মন্দ দিক হ'ল এই যে, এতে প্রতিযোগিতা সমিভ থাকে এবং প্রতিযোগিতার অভাবই বাস্তবিক পক্ষে ভারতের রাজনীতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক ভারত বিজয়ের কারণ।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিদায়ী অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

১৯৭৫-৭৬ সালের কলেজ পত্রিকার জন্যে একটা লেখার তাগিদ এসেছে পত্রিকাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের কাছ থেকে। নিয়মমত ৭৫-৭৬ এর পত্রিকা ৭৬-৭৭ এর সুরুতেই প্রকাশিত হওয়ার কথা, কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটু ভয়ও থাকে যে সময়মত সবকিছু না হতেও পারে অথচ ১৯৭৭ এর ১লা মে আমার কলেজ থেকে অবসর নেবার দিন। সেজন্যে এবার লিখতে একটু দ্বিধা বোধ করেছি, তবুও অনুরোধ রাখতে হবে ও হচ্ছে।

১৯৭৬ সালের ১৭ই জুলাই কলেজের ষাট বছর পূর্ণ হোল, কলেজের হীরক জয়ন্তী। কলেজের ষাট বছর জীবনের মধ্যে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর এর সঙ্গে যুক্ত থাকার ও সেবা করার যে সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে তা ভাবতেও আজ গর্ব্বে মনটা ভরে ওঠে। দেখেছি অসংখ্য ছাত্রছাত্রী (কিছুকাল আগেও প্রাতর্বিভাগ আশুতোষ কলেজের সঙ্গেও যুক্ত ছিল, আজও মনে হয় সঙ্গেই আছি) নিজেদের জীবনের প্রস্তুতিপর্ব্ব এই কলেজে সাঙ্গ করেছে, তাদের পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছে ও কলেজকে দিয়েছে তাদের ভালবাসা। দেখেছি সেই উৎসাহী, ত্যাগী, উৎসর্গীকৃত, সেবাপরায়ণ বিদ্বান অবসরপ্রাপ্ত সহকর্ম্মিদের (শিক্ষক ও কর্ম্মচারী), আজকের কলেজ যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় ফলশ্রুতি। তাঁদের জানাই আজ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন; যাঁরা তাঁদের মধ্যে পরলোকগত তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের প্রণতি।

ব্যক্তির পক্ষে হলেও, কলেজের পক্ষে ষাট বছর এমন একটা বিরাট অতীত নয়, তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আরও বেশী। সে জন্যেই কলেজের অতীত ব্যক্তির মন ভরাবার পক্ষে যথেষ্ট হলেও, ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়বার জন্যে ভাবতে হয়, দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। আশার কথা যে, এই সচেতনতা ও দৃঢ় সঙ্কল্প শুধু আমার মনের কথা নয়, সেটা আমার সহকর্ম্মী শিক্ষক ও কর্ম্মচারী সকলেরই মনের কথা। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এটাও বলতে পারি যে অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যেও কলেজের প্রতি শ্রদ্ধা আসক্তি ভালবাসা, এমন কি গর্ব্ববোধও মোটেই দুর্লভ নয়। তারাই তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নেতৃত্বে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আমরা চেয়েছি, আজও চাই দৃঢ়চেতা, সংবুদ্ধিসম্পন্ন, চরিত্রবান ছাত্র তৈরী করতে শুধু মাত্র উপদেশ দিয়ে নয়, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুশিক্ষা দিয়েও। দেশ, সমাজ ও সময় বদলায় কিন্তু যে গুণ, যেমন বল, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও মনীষা ব্যক্তি ও জাতিকে শক্তি দেয় তার কোন বদল হয় না। আমরা সব সময়ই অনুভব করি, "good intentions are more common than good knowledge" ও আমরা বিশ্বাস করি, ছাত্রদের জীবন ভবিষ্যৎ ও চরিত্র গড়বার কাজে কলেজ একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ছাত্রদের কাছে কলেজ জীবন সামান্য কয়েক বছরের মাত্র তবুও এই জীবন তাদের ভবিষ্যৎ গড়তেও পারে, আবার ভাঙ্গতেও পারে, সেই জন্যেই এই জীবন এত গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্কটময়। ভবিষ্যৎ

আন্তকলেজ বাইচ (রেগেটা) প্রতিযোগিতায় বিজয়ীবৃন্দ !

১৯৭৫-৭৬

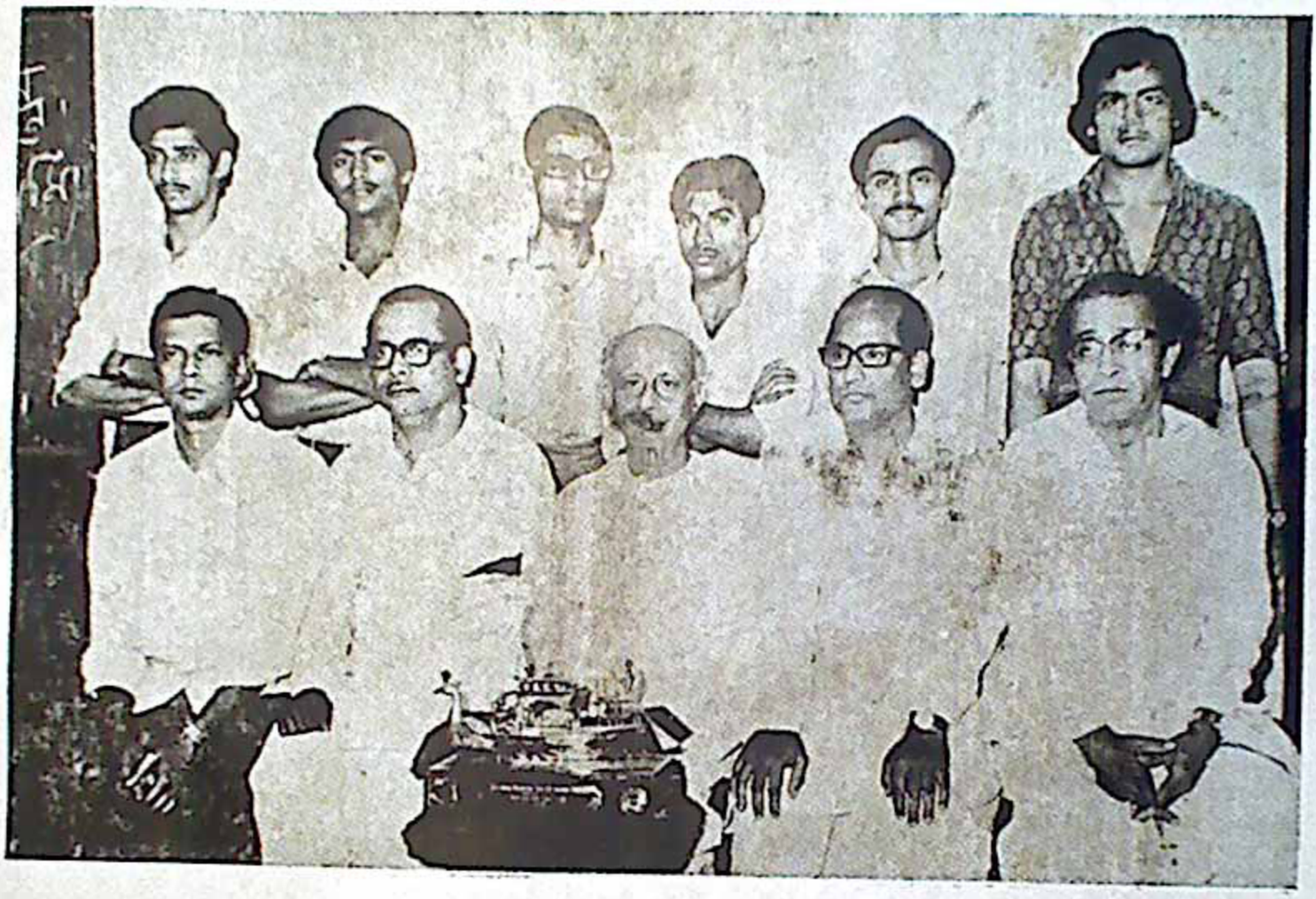

বসে আছেন : অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ক্রিকেট), অধ্যাপক প্রভাত কুমার রায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নৌ-চালনা) অধ্যক্ষ নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য, সহাধ্যক্ষ দুলাল কুমার মিত্র, অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, (ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফুটবল)।

দাঁড়িয়ে আছেন : সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর গুহ, শ্যাম চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষক), চিররঞ্জন কাঞ্জিলাল (অধিনায়ক), শঙ্কর বৈদ্য, পার্থ ভাদুড়ী ॥

সম্পাদকীয়

নানা অসুবিধার ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আশুতোষ কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল। মুদ্রণের অসুবিধা, লোড শেডিং, কলেজ ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পরীক্ষার জন্য ছাত্র অধ্যাপকদের নিয়মিত যোগাযোগের অভাব, সময়মত পত্রিকার রচনাদি প্রেসের উপযুক্ত করে তোলার সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। অথচ কলেজ পত্রিকার জন্য ছেলেদের নির্ভেজাল উৎসাহ। এই দোটানার মধ্যে এর প্রতিকারের উপায় ক্রমে আমাদের নাগালের বাইরের চলে যেতে পারে বলে ভয় হচ্ছে। প্রকাশক কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যায়তনের মুখ পত্রটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা থেকে প্রকাশ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছি। আনন্দের বিষয় সম্পাদকীয় দপ্তরের ছাত্র প্রতিনিধিরাও এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন।

ছাএদের জানাচ্ছি ভবিষ্যতে যেন তাঁরা ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পিঠে গোটা হরফে পরিষ্কা করে লিখে ঘোষিত তারিখের মধ্যে কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক অথবা সম্পাদকদের কারো কাছে তাঁদের রচনাবলী ইত্যাদি জমা দেন। লেখার কপি যেন রাখেন কেননা অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকমণ্ডলীই রচনা নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী। ইংরেজী, বাংলা একাধিক রচনাকে খারাপ হাতের লেখার জন্য আবার কপি করে অথবা টাইপ করে নিতে হয়েছে। পকিা প্রকাশে বিলম্বের এটাও অন্যতম হেতু। বাংলাভাষা সাহিত্য ছাড়া বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক দর্শন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক 'টেকনিকল্' রচনা ছাত্র লেখকগণ সেই বিষয়ের কলেজ বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপদের দেখিয়ে তাঁদের মন্তব্যসহ জমা দিলেই ভাল হয়। এবারও আমরা রচনাগুলি সেই পন্থায় নির্বাচিত করেছি।

হিন্দী ইত্যাদি অন্য ভাষাভাষী ছাত্রদের রচনা সাদরে গৃহীত হবে।

কলেজের পুরাতন সংখ্যাগুলি থেকে সংকলিত করা হল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের রচনা যাঁরা সাহিত্যলোকে দশের এক।

রচনাগুলি সম্পর্কে যে কোনো ছাএ অধ্যাপক ও কলেজ কর্মীর মত মন্তব্য পত্রাকারে আমাদের কাছে এলে আমরা সাগ্রহে তা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করব।

উনিশো ছিয়াত্তরে পার হয়ে গেছে কলেজ পত্রিকার হীরক জয়ন্তী বর্ষ (১৯১৬—১৯৭৬)। পরবর্ত্তী সংখ্যাটিকে তাই বিশেষ সংখ্যা হিসাবে চিহ্নিত করে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সৃজন কাল ও প্রভাবকে ডিঙ্গিয়ে কল্লোল প্রগতি কালি-কলম-এর যুগে যে আধুনিক সাহিত্যের সূচনা হল তার প্রতিনিধি ছিলেন তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুকান্ত এঁরা। এরপরও পঞ্চাশ ষাট সত্তর দশক ধরে দ্রুত তালে বাংলা সাহিত্য এগিয়ে চলেছে রূপান্তরিত হচ্ছে। কালের কপালে পরিবর্তিত ঋতুর রৌদ্ররেখার মত চলেছে তার অয়নান্তর এই সজীবতা স্পন্দন ও প্রগতিই সাহিত্যের প্রাণ। এই নবতার একটা ঝোঁক ও হুজুগও এসে পড়ে। অপসংস্কৃতির আবর্জনায় মৌলিক চিন্তা

ছাত্রদের প্রতি একটি প্রতিবেদন

অনেক অনেক কাল পরে আজ পশ্চিম বাংলায় একটা দারুন দুঃসময়ের কালো ছায়া পড়েছে। ছিয়াত্তর পঞ্চাশ ইত্যাদি সন তারিখ ময়ন্তরের ভাবানুসঙ্গ নিয়ে আসে। উনিশ শো আটাত্তর নিয়ে এল বন্যা! সর্বব্যাপিনী! সর্বপ্লাবিনী! ইংরেজীতে বলা যায় টোটাল ডিজাস্টার'।

বাংলার অর্থনীতি সংস্কৃতি এই দুর্যোগে যে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত তার পরিমাণ হয়ত এখনই করা যাবে না, তবু আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বিশেষ করে ছাত্ররা সারা বাংলা বন্যাত্রাণে তাদের বিপুল কর্মশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা সুস্থ সবল যৌবচেতনা ও ত্রাণকার্যে স্বার্থত্যাগের অকুণ্ঠ প্রয়াস আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে মর্যাদা দাবী করে।

তাই আবেদন জানাই এ কাজ আরো ব্যাপক হ'ক। ভয়াবহ বন্যা কবলিত প্রায় সমস্ত জেলার দুর্গত মানুষের ত্রাণকার্যের জন্য সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ অব্যাহত গতিতে চলেছে। বন্যাক্লিষ্ট মানুষের পুনর্বাসন অর্থনীতিক পুনর্গঠন সর্বশ্রেণীর কর্মীর দল-মত-নির্বিশেষে হাত মিলিয়ে কাজ করার সংসাহস আমরা হারিয়ে ফেলিনি।

বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন এই জাতীয় বিপর্যয়ের দুঃসময়ে বন্যাক্লিষ্ট মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলে তুলে ধরেছেন বাঙ্গালী যুব সমাজের অতীত আদর্শ "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" এমন কি কেউ কেউ উদ্ধার কার্যের প্রাথমিক অবস্থায় নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এখনও অনেক ছাত্র শোণিত-সংরক্ষণাগারে (Blood Bank) রক্তদান ক'রে, বিনিময়ে সংগৃহীত অর্থ পুনর্বসতি ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে সাহায্যের জন্য দান ক'রে চলেছেন। ব্যাপকভাবে দেখলে শহরের স্বাভাবিক, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ দিনযাপনের মধ্যেও তরুণ সম্প্রদায় সমাজ চেতন মানুষ এই অভাবনীয় সংকটের ঘোরান্ধকারে স্বজাতির পাশে, বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার কিষাণ-শ্রমিক মেহনতী মানুষের পাশে। অগণিত শোকার্ত্ত নর-নারী শিশু-বৃদ্ধের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ও কোনো না কোনোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। বন্যদুর্গত ছাত্রদের মধ্যে বইখাতা পেনসিল ও নানা সরঞ্জাম বিতরণের উদ্যোগও ছাত্ররা নিজে হাতে নিয়েছেন। এবং এখানেও দলমত নির্বিশেষে ছাত্র সংস্থাগুলির মানবিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংস্থা নানাভাবে পুনর্বাসন ও গ্রামবাংলার জনজীবনের পুনরুজ্জীবনের সাহায্য ব্যবস্থায় তাঁদের সার্থক অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

কিন্তু বন্যাত্রাণের কাজ এখানেই চুকে যায় না। বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিম বাংলার মানুষ, তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি জীবন ধারণ ও জীবিকার যে ঘাটি হারিয়েছেন সেই শূন্যতা ও ট্রাজিডির শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কেন এই বন্যা হল? এর ভবিষ্যৎ প্রতিকারের স্থায়ী পথ কি? পশ্চিম বাংলার

সূচীপত্র

বিশ্বাস	জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়	১
আমরা কত বড়	দুলাল কৃষ্ণ সরকার	২
ভ্রান্ত পথিক ঈশ্বরের কাছে	বিশ্বনাথ দাস	৭
সাহিত্য ও রাজনীতি	জয়দেব ভট্টাচার্য্য	৮
সাহিত্য ও রাজনীতি	মৌলিনাথ রায় চৌধুরী	১১
মন ভাল নেই	জগৎ পাল	১৩
শতবর্ষের আলোয় শরৎচন্দ্র	দীপক দত্ত	১৪
রাক্ষসীর জটা, লক্ষ্মীর নূপুর	গুনধর হালদার	১৫
মাঝে মাঝে এই রকম	প্রদীপ ঘোষ	১৭
On the Creative Process	Prof. Ramendra Nath Dutta	১৮
আমার মা	সোমনাথ গুপ্ত	২৮
নাটিলাস আঘাতের পূর্ব মুহূর্ত	দেবাশিস মজুমদার	২৯
ক'লকাতার জিরো আওয়ার	অধ্যাপক উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য	৩৩
সে এবং মানসী	গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
Matter	Subhas Ch. Nath	৪৩
তুমিই আসামী	কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০
দুটি কবিতা	মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়	৫১
কলকাতা এবং তার মানুষজন	দেবাশিষ মজুমদার	৫৩
রাজনীতির মঞ্চ তার কুঁড়ে ঘর	শ্রীরুদ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়	৫৪
নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও ছাত্র সমাজের দায়িত্ব	গৌরী শঙ্কর ভাণ্ডারী	৫৭
Inter Disciplinary Dialogue	Kalipada Bakshi	৫৯
বন-জ্যোৎস্না	মানস ভট্টাচার্য্য	৬৩
কাটিয়া হাটের ইস্‌মাইলের ভ্যানরিকসা	গোবিন্দ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮
রাত শেষ ঘুম পায়	সৌমিএ ভট্টাচার্য	৭২

বি শ্বা স

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়
২য় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অনার্স

উঁচু দরজার নির্মম অবরোধ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম,
দশ আঙ্গুলে অমূল্য পাথর বসানো আংটী।
স্ফীতোদর শাসকের সোনা বাঁধানো দাঁতের
অশ্লীল হাসি প্রত্যক্ষ করলাম।
দলিলে রাখলাম দ্বিধাগ্রস্ত স্বাক্ষর
মনুষ্যত্ব বিক্রয় করলাম।
পার্থিব জগতের প্রিয়তম বস্তু বুকে নিয়ে
ক্লান্ত বিধ্বস্ত পদক্ষেপে ফিরে এলাম
ভাঙ্গা ঘরের নিঃস্ব আস্তানায়।
একা!
জীর্ণপ্রায় কাঠামোটা আমাকে আচ্ছন্ন করল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে।
যার আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে এতদিন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করেছি
পরিবেশের শিকার হয়েও।
জানি আমি প্রকৃত দোষী নই।
কারণ এই পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় কিছু সৎ লোক এখনও আছেন
যাঁরা নিকট ভবিষ্যতে আমাদের মন থেকে মুছে যাবেন।
অথবা বেঁচে থাকবেন অসৎ লোক হয়ে।
কারণ আমাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই এক নেশা।
হোক না সে কৃষিকীটের জীবন।
যেহেতু তাজা বাতাস ফুস্‌ফুসে টেনে নেওয়ায়
এক অতুলনীয় স্বাদ আছে।
তবু অসংখ্য মানুষের কাঠামোধারী পশুদের একজন হয়েও
আমি বিশ্বাস করি সচেতন ব্যক্তিত্বশালী একদল মানুষ
একদিন জয়ী হবেন।
অসুস্থ সমাজের শত সহস্র নগ্ন আক্রমণেও
যাঁদের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের দুর্গ মাটির বুকে গভীর শিকড় নামিয়ে
অটল অনড় অজেয় দাঁড়িয়ে থাকবে। নতুন দিগন্তের দিশারী।

— • —

লোকটির দেহে চার হাজার অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার পরমাণু থাকবে। এখন একগ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে ছয়শত কোটি কোটি কোটি! তা হলে ঐ লোকটির দেহে এর চার হাজার গুণ বেশী অর্থাৎ চব্বিশ লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি পরমাণু থাকবে! সাড়ে তিন কেজি ওজন নিয়ে যে শিশুটির জন্ম হল তখনই তার দেহে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি কোটি কোটি পরমাণু নাচন লাগিয়েছে। যদি পূর্ণতা লাভ করতে শিশুটির সাড়ে বাইশ বছর লাগে, তবে এই হিসাবে প্রতি বছর এক লক্ষ কোটি কোটি কোটি পরমাণু সে পৃথিবী থেকে শোষণ করে নেবে। প্রতি দিনের হিসাবে তা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাতাশ কোটি কোটি কোটি পরমাণু। এমন আর বেশী কি! প্রত্যেকে মাত্র এক একটা পরমাণু জগত।

পৃথিবীতে এখন মাত্র কয়েক শ কোটি লোক আছে, আর অন্যান্য স্থলচর, জলচর এবং খেচর প্রাণীদের নিয়ে এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরুলতাগুল্মের মঙ্গল নিয়ে জীবনধারীরা কি পরিমাণ শোষণ করছে, তা কি অনুমানে আসে? সন্তান বলে সর্বংসহা মাতা বসুন্ধরা শুধু নীরবে সহে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের উপর, বিশেষ কোনো সন্তানের অত্যাচার তার নজর করবারও ফুরসৎ নেই।

এই মায়ের রূপটী প্রত্যক্ষ করতে মায়ের কোল থেকে একটু সরে যেতে হবে। নিমেষে মিলিয়ে যাবে পৃথিবীর বুকের দুর্গন্ধ-ক্লেদাক্ত স্থান, ফুটে উঠবে শ্যামল-শুভ্র-নীল বিশাল পৃথিবী। আরও একটু সরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে মহাশূন্যের বুকে একাকী ভেসে বেড়াচ্ছেন মাতা বসুন্ধরা নীলাভ তাঁর তনুখানিকে পাতলা মেঘাস্তরণে ঈষৎ আবৃত করে আর ধীর স্থিরভাবে একমনে আবর্তিত হয়ে সূর্যাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছেন বৎসরের পর বৎসর ধরে।

আমাদের এই পৃথিবী পরিসরে প্রায় আট হাজার মাইল, বেষ্টনীতে প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল, পদার্থ পরিমাণে প্রায় ছয় কোটী কোটী কোটী টন। সূর্য্য থেকে নয় কোটী তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে বৎসরে সূর্য্যকে একব র প্রদক্ষিণ করে আসছে।

সূর্য্যের দিকে আরও সরে গিয়ে সূর্য্যের দিকে ফিরলে দেখা যাবে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড তার তেজ আর দীপ্তি দিয়ে যেন সকলকে ঝলসিয়ে এবং ধাঁধিয়ে দিতে চাইছে। ছয় কোটী কোটী কোটী টনের তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার পৃথিবীকে জ্বালিয়ে একটা বাষ্পপিণ্ড তৈরী করলে যা দাঁড়াবে তাই হচ্ছে এই সূর্য। পদার্থ পরিমাণে প্রায় দুই লক্ষ কোটী কোটী কোটী টন, পরিসরে আট লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মাইল। বরফ যে কত ঠাণ্ডা তা সকলের জানা আছে, আর ফুটন্ত জল যে কত গরম, তা বোঝানোর জন্য কারো গায়ে এক পিপে ফুটন্ত জল ঢেলে দিলে সে বোধ করি জীবনে আর বুঝতে আসবে না। বরফের উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী ধরলে, ফুটন্ত জলের উত্তাপ একশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়। এগিয়ে গেলে, এক হাজার তেষট্টি ডিগ্রীতে সোনা, এক হাজার তিরাশি ডিগ্রীতে তামা,

মাটি সোয়া চার আলোকবর্ষ দূরে রাজত্ব করেন। অর্থাৎ গত চার বৎসরের মধ্যে 'আলফা' রাজের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে, আমরা সূর্য্য-রাজ্যের অধিবাসীরা তা এখনও জানতে পারিনি।

ছায়াপথ যে নক্ষত্রজগত, তা এইসব উদ্ভপ্ত নক্ষত্র এবং তাদের প্রভাব অঞ্চল নিয়ে গঠিত এক বিরাট কুণ্ডলীচক্র। সর্বদেহই তার নক্ষত্রখচিত, মধ্যে মধ্যে ধূলি আর বাষ্পমেঘ কোথাও বা নক্ষত্রসংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার কোটী; অতএব পদার্থ—পরিমাণ অন্ততঃ সূর্য্যের দশ হাজার কোটী গুণ। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছুতে আলোকের লাগে এক লক্ষ বৎসর। কেন্দ্রের কাছে এই চক্রটি পুরু, এ পিঠ থেকে ও পিঠে যেতে আলোকের লাগে তের হাজার বৎসর। ছায়াপথের জ্যোতিস্নাত অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে আলোকের লাগে পাঁচ লক্ষ বৎসর। সমগ্র চক্রটি মহাশূন্যে আবর্তনশীল, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আবর্তন হার দূরের অঞ্চলের আবর্তন হার অপেক্ষা বেশী। আমাদের সূর্যানক্ষত্র ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং কেন্দ্রকে বিশ থেকে পঁচিশ কোটী বৎসরে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করতে পারে। সমগ্র নক্ষত্রজগতের মধ্যে সূর্য কোথায় মিলিয়ে যাবে তার চিহ্ন রাখা সহজ নয়।

এহেন নক্ষত্রজগত—আমাদের ছায়াপথ অপেক্ষাও বৃহত্তর নক্ষত্রজগত অনেক আছে। আমাদেরই নিকটতম প্রতিবেশী, নাম তার 'অ্যাণ্ড্রোমেডা', আমাদের অপেক্ষাও বড় নক্ষত্রজগত, আলোকের বাইশ লক্ষ বৎসরের দূর। গোটা তিরিশেক এই রকম নক্ষত্রজগত প্রতিবেশী হয়ে সৃষ্টি করেছে 'স্থানীয় মণ্ডল'।

দূরে, ওইখানে, আরও কতকগুলো নক্ষত্রজগতের একটা মণ্ডল দেখা যাচ্ছে, কন্যারাশির মধ্যে, ওরাই আমাদের সব থেকে কাছের; এখন যে আলোয় আমরা ওদেরকে দেখছি, তা ওদেরকে ছেড়ে এসেছে ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর আগে।

আরও দূরে মহাকাশে নক্ষত্রজগতগুলো ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলাকারে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। কোনো কোনো মণ্ডলে এক হাজার নক্ষত্রজগতও আছে। সব থেকে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে যতগুলি নক্ষত্রজগতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা হ'ল একশত কোটি। এরা কেউই স্থির নয়। এরা যে আবর্তন করে, তার স্পষ্ট প্রমান পাওয়া গিয়েছে আলোকচিত্র নিয়ে।

দূরবীণের দৃষ্টিশক্তির বাইরে আরও কত নক্ষত্রজগত আছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই। রেডিও দূরবীণ দিয়ে আরও অনেক নক্ষত্রজগতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং চলেছে। কিন্তু তারও একটা সীমায় আমরা একসময়ে এসে পৌছুবো। কিন্তু তবুও মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি কতখানি তা আমাদের জানা হবে না হয়ত।

ভ্রান্ত পথিক, ঈশ্বরের কাছে

বিশ্বনাথ দাস
প্রথম বর্ষ-স্নাতক কলা বিভাগ

ক্লান্ত দেহে প্রভাকর অস্তাচল গত,
শ্রান্ত পথ-ভ্রান্ত ও কে পান্থশালা একা
করে অন্বেষণ! যামিনী আগত প্রায়—
প্রভঞ্জনে, এ দুর্গম পথ; অবিলম্বে
চাই এক ঠাঁই। বিহগী অম্বর মাঝে
সারাদিন করি বিচরণ খুঁজে ফেরে
আপনার নীড়; সূর্য মসীরেখা টানে।
শিশুরা সমাপ্ত ক'রে ধুলি খেলা; ব্যগ্র
জননীর স্নেহভরা কোলে ফিরে যেতে।
গোধূলি উত্তীর্ণ হয়। রাত হয় শেষ
সূর্য ডোবে নদী বয় নিত্য প্রথামত।

ভীত ত্রস্ত পথিকেরে কে চেনাবে পথ?
কে দেখাবে আলো তারে? হেথা নাই আলো,
নাই কোনো গৃহ চিহ্ন, ওগো দয়াময়
দয়া করে শক্তি দাও জিনিতে বিপদ।
বীজ থেকে সৃষ্টি করো মহাবনস্পতি।

সুতরাং সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্ক বিচার করতে গেলে তাদের এই নাগরিক সভ্যতার মান দণ্ডে বিচার করতে হবে।

এই যে বাঁচা, বেঁচেবর্ত্তে থাকা, দিন যাপনের প্রাণ ধারনের গ্লানি নয় এই জীবনের ওপর সাহিত্য আর রাজনীতির পারস্পরিক প্রভাবের বিচারেই এই সম্পর্কের কিছুটা চরিত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। কত টন চাল সংগৃহীত হবে তেল উত্তর প্রদেশ থেকে কেন আসছে না, এবং এর পিছনে বুর্জোয়া পুঁজিপতির যে চক্রান্ত কাজ করে চলেছে - তার নির্ধারক রাজনীতি। হত্যার তদন্ত বসবে কিনা মুখ্যমন্ত্রীর বাথরুমে কত খরচ প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ধারে বিয়ার খাওয়া এসবও রাজনৈতিক হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ভাবার সময় এসেছে প্রবোধ সান্যাল আর ভ্রমনোপন্যাস লিখবেন কিনা, তার পথ কেমন হবে। অমুক গল্পের রনলা ও সুখেনের দৈহিক মিলনের দৃশ্য অশ্লীল কিনা এর রাজনীতির আলোচ্য বিষয় হবে কিনা।

রাজনীতি বড় প্রত্যক্ষ, চোখে লাগে। অমুকে এলেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড জনসমুদ্র এবং পরের দিনের আনন্দ বাজারের ফাটাফাটি এ্যাংগলিক ফটো। তিন দিনের ভোটে এক মূষিক ব্যাঘ্র ও অন্য ব্যাঘ্র মূষিক হয়। কিমাশ্চর্য্যম্। এত পলকা ফিনফিনে, ভিত্তিহীন এর বিশেষ 'নীতিটি'।

সাহিত্য অন্তর্জগতের। মানুষের ভেতরে ভেতরে যে রক্তক্ষরণ, যে আকুল বিকুল আনন্দ যে শিরাছেড়া যন্ত্রনামথিত সুখ ও যুগপৎ দুঃখ তা সাহিত্যই সৃষ্টি করে। যে কোন প্রবঞ্চকের হৃদয় বদলাতে সময় লাগবে চার ঘন্টা যদি সে সাহিত্য পড়ে।

সাহিত্যে রাজনীতি আসবে কিনা এ নিয়ে দেড় হাজার পৃষ্ঠার একটা থিসিস লেখা যায়। তবে রাজনীতিতে সাহিত্য আসবে এ কথা ক্লাস সেভেনের বিমলও জানে। সাহিত্য মানুষের পরিপার্শ্ব। অন্তর্দেশের ডাইরি, অন্তর্দেশীয় চিঠি। সুতরাং রাজনীতি আসতেই পারে। এই বাঁচার গল্পকে রাজনীতি কতটা প্রভাবিত করে, ততটাই আসতে পারে, তার বেশী নয় রাজনীতি সাহিত্যের বাইরের বাড়ীর নাটমন্দির। ওখানে অনেকে আসে, অনেকে যায়, কিন্তু গৃহিনী যেখানে রান্না করেন বাইশ বছরের তরুণী মেয়েটি যেখানে লুকিয়ে কাঁদে, সেখানে তার স্থান প্রবেশাধিকার অনুপ্রবেশের মত, কদাচ উচিত নহে।

এবার শব্দের ভিতরে প্রবেশ করা যাক। রাজনীতিকে যদি ছেঁড়াখোঁড়া যায়, তবে একটা বিশেষ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ নীতির আবিষ্কার হবে, আর সাহিত্য এসেছে 'সহিত' শব্দের থেকে। মনুষ্যসৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত থেকেই এর যাত্রা আমাদের সাথে, শেষের সে দিনে সেই যোগাবে আশা, বাড়াবে বুকের বল, সঞ্চালিত করবে বুদ্ধিকে, প্রদীপ্ত করবে হৃদয়কে। রাজনীতি উঠেছে রাজধানী থেকে।

সাহিত্য ও রাজনীতি

মৌলিনাথ রায়চৌধুরী
৩য় বর্ষ স্নাতক কলা বিভাগ

বংকিম চন্দ্রের ভাষায় "সাহিত্য সমাজের দর্পণ" এবং রাজনীতিবিহীন সমাজ বর্তমানে কাঁঠালের আমসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব দুয়ে দুয়ে যেমন চার হয় তেমনই আমরা এই মতে উপনীত হতে পারি যে সাহিত্য সমাজের দর্পন হলে রাজনীতির সংগে সাহিত্যের যোগ থাকবেই, তাই "সাহিত্য শুধু সাহিত্যের জন্য" এই ধারনাকে আকড়ে ধরে থাকা আজ নির্বুদ্ধিতার নামান্তর মাত্র। কিন্তু যে প্রশ্নকে আজ সবার সামনে বড় করে তুলে ধরতে হবে তা হলো যে সাহিত্য শুধু মাত্র রাজনৈতিক ধ্যান ধারনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে কি না? বড় বড় রাজনৈতিক প্রবক্তারা হয়ত এই প্রশ্নের হ্যা বাচক উত্তর দেবেন, কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে সম্পর্কের মাধ্যমে এবং প্রেম প্রীতি স্নেহ মমতা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি মানবিক মূল্য বোধগুলি কোন রাজনীতির জটিল চক্রের আবর্তে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। এই মূল্যবোধগুলি প্রধানতঃ রাজনীতির সংসর্গমুক্ত। তাই শুধু মাত্র এই মানবিক মূল্যবোধগুলিকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠবে তাতে কোন রাজনৈতিক মত ফুটেনা উঠলেও তা সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হবে এবং তা নিশ্চয়ই সমাজের দর্শন। অতএব একথা আমাদের স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে রাজনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ছাড়াও সুসাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ সাহিত্য রাজনীতি নির্ভর নয়। আর একথা অনস্বীকার্য সে রাজনীতি নির্ভর হয়ে কোন সাহিতাই বেঁচে থাকতে পারে না।

আমরা যে মতে উপনীত হলাম সেই মতে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা এই কথা মেনে নিয়েছি যে প্রেম প্রীতি ভয় ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধগুলি রাজনীতির সংসর্গমুক্ত। এখন আমাদের পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন যে আদৌ এই মানবিক মূল্যবোধগুলি রাজনীতির সংসর্গ মুক্ত কিনা।

আধুনিক অর্থে রাজনীতি শুধু রাজারনীতি বা নীতির রাজা নয়। রাজনীতি হল রাত্রের নীতি—যে নীতির দ্বারা রাষ্ট্র তার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবে। এই নীতি তৈরী করবে মানুষ। এবং মানুষ কোন কাজ তার মানবিক মূল্যবোধগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েই করে। অতএব, রাজনীতি মানবিক মূল্যবোধের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। মানবিক মূল্যবোধগুলি প্রত্যেক মানুষের কাছে সমান হলেও তার মাত্রার হের ফের আছে। পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ ব্যাপারটা সব মা বাবার

মন ভাল নেই

জগৎ পাল
২য় বর্ষ : যায়ানিক বাংলা

মন ভাল নেই তাই
কবিতা লেখা হবে না
ফুল ফুটে উঠবে না,
পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবেও
কোন রং ছড়াবে না;
চাঁদ যদি ওঠে মাঝ রাতে
তাকে ঢেকে দেবে মেঘ
কোন ফুল যদি গন্ধ ছড়ায়
বাতাস স্তব্ধ হবে।

মন ভাল নেই তাই
আমার জানালা বন্ধ থাকবে
জ্বলবে না কোন বাতি
ডায়েরীর পাতা শুন্যই থেকে যাবে।

মন ভাল নেই তাই
শুধুই তোমায় চিঠি লিখব।
সে চিঠি কি কবিতা?
জানি না তা।

রাক্ষসীর জটা, লক্ষ্মীর নূপুর

গুণধর হালদার

স্নাতক দ্বিতীয়-সাম্মানিক বাংলা

ছোট বেলায় যখন স্কুলের ছাত্র তখন মাষ্টার মশাই বলতেন—"বন্যা সম্বন্ধে রচনা লেখো।" মনের মধ্যে একটা কথা বার বার রেখাপাত করতো যে বন্যার বহু কথাতো লিখলাম কিন্তু এটা ঘটে কি? বোধ হয় না। 'কবিতা বনিতা লতা'র মতো কবিরা বোধ হয় বাড়ান। হঠাৎ দিন এলো। বন্যার তাণ্ডবলীলা দেখার সুযোগ হলো। প্রকৃতি দেবতা বোধ হয় এ আকুল প্রার্থনা শুনলেন, তা না হলে কখনো সম্ভব হত না। মঙ্গলের উষা ভোর হলো। সকাল বেলাটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগলো দূর থেকে গ্রামের লোক গ্রামান্তরে পৌঁছে গেলো। আর আমরা কয় ভাই সেই পাঠাভ্যাসে রত। সকাল তখন আটটা। ঘড়ির কাঁটায় মিল হয়েছে। ঠিক ওই মিলনের সুরে আর এক মিলনের বাঁশী বেজে উঠলো, আস্তে আস্তে ঝড় বইতে শুরু করলো। জানালার ছিটকি তুলে দিলাম, বাতাসের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ হলো তারপর আস্তে আস্তে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বেলার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির দাপট যেমন বাড়ছে তেমনি ঝড়েরও। নটার সময় হঠাৎ একটা কান্নার রোল উঠলো। জানালা বন্ধ। বাহিরের পথ তখন কর্দমাক্ত। আমাদের খাবার সময় ওঠার কথা, কিন্তু থাকতে পারলাম না। মনে করলাম কারও বোধ হয় শিশু পুত্রটি মারা গেছে, নয়তো বা বৃদ্ধ পিতা মাতার মৃত্যু ঘটেছে। বাইরে আসার সাথে সাথে সবাই দৌড়ে যাচ্ছে নদীর বাঁধের দিকে। আমরাও বইপত্তর রেখে ছুটলাম ওদের সাথে। নদীর বাঁধে ওঠার আগেই চেয়ে দেখি সুতার বাঁধ নদীতে বন্যা আসছে। বন্যার জল সমুদ্রের পাড় থেকে যেন শতগুণ উঁচু হয়ে গ্রামবাটীদের রাক্ষসীর মতো গ্রাস করতে ছুটে আসছে। তখন দেখার সময় নেই, সবাই ছুটে চললো ঘর সামলাতে। আমি কিন্তু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখার নেশায় বাঁচার নেশা ছুটে গেছে। আর যাওয়ারই কথা কতোদিনের অবাঞ্ছিত ফল আমার ভাগ্যে যে এমন ভাবে আসতে পারে না কল্পনায়ও আসেনি। হঠাৎ কে যেন আমার পিঠে হাত দিয়ে বললে—"পালিয়ে আয়রে ছোড়াটা ডুবে মরবি" অস্ফুট ভাষায় কিছু বলার আগে চেয়ে দেখি আমাদের মাঠের মধ্যে রাক্ষসী প্রবেশ করেছে। আর যেমন ভাবে আছে তাতে ডুবে মরা ছাড়া কোন পথই নেই। তখন প্রাণের আশা ত্যাগ করলাম ছুটে গিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলাম। কিন্তু নদীর বাঁধে ভাল ছিলাম। এখানে এসে যেন কান্নার পাহাড়ে ধাক্কা খেলাম। চারিদিকে বাঁচার জন্য একটা তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেছে। দৈত্যরা যেন স্বর্গভূমি আক্রমন করতে ছুটে আসছে তাই দেবতাদের

মাঝে মাঝে এই রকম

অদীপ ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ যান্ত্রিক বাংলা

আমার অনেক জ্ঞান
আজ—বৃহৎ রাক্ষসের মত
আমাকেই বধ করতে এগিয়ে
আসে ; দীর্ঘ পদক্ষেপে

সিগুলের পথ ঘুরে দুরন্ত
বিমান
আকাশ কালো ক'রে
তীর বেগে দূরের দিকে
ছুটে গেছিল অনবদ্যতার
ভঙ্গি নিয়ে

জানি, আমার বিষণ্ণতা
সারা পৃথিবীকে
গ্রাস করবে
বিস্মিত মড়ার খুলির মত
আমি তাই স্বপ্নে দেখি
এক গাদা চিতার পাশে

লালচে আগুন ধরা পদ্মর রাশ
আর
অনির্বান নাভি পিণ্ড।

Plato's cogitation on the matter thus rejects the involvement of the human mind in the process of creation. This theory has been quite justifiably rejected wholesale, for it has been established in the following ages that the human mind is directly and inextricably involved in creation.

Aristotle took up the matter and expressed a different, we can say an almost opposed, view Nowhere in **Poetics** we come across an explicit and categorical assertion of his view point. But his exclusive emphasis on the form in poetry ('action' as he termed it in the course of his discussion on tragic poetry) brings in the element of deliberation, the importance of the human conscious mind in the act of creation The harmonious organisation of the component parts of a tragedy calls for, by way of implication, the conscious exercise of reason. The inspiration of the poet had been, since early classical times, a main reliance of those who would account for ths element of the mysterious in poetry. The muse invoked by Homer or Hesiod personified the magnetic freazy ironically ascribed by Socrates both to the unscientific bard and his enraptured critic. In later artiquity, Longinus in his On the Sublime centred these ideas more in the divine inspiration than in the great soul– the great thoughts and emotions of the poet himself.

It may be noted here in passing that upto the Elizabethan age, we do not find a steady progress of critical thinking on the problem of creativity Even the Rennaissance Aristotelians (Castelvetro, Scaliger, Minturno in Italy and Sidney in England) did not pause to enlighten our understanding of the creative process But when we come to the great age of romantic literature in the early years of the nineteeth century, we are confronted with a variety of views which, if not comprehensiue, at least whips up our interest in the problem. Almost all the major creative artists of the period gave the matter a serious consideration and came up with curious answers all equally differing from one another.

Coleridge in his **Biographia Literaria** met the problem with his novel idea of imagination. In chapter XIII of the book, he dwells on the nature of imagination, and on how imagination creates : "It (secondary imagition) dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate ; or where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles to idealise

On this point also, Wordsworth offers us an impressive fragment of a theory : "Not that I always began to write with a distinct purpose formally conceived but habits of meditation have, I trust, so prompted and regulated my feelings, that my descriptions of such objects as strongly excite those feelings will be found to carry along with them a purpose. If this opinion be erroneous I can have little right to the name of a poet". Creative power in him, as in most great poets, was accompanied by a high degree of critical intelligence Wordsworth elaborates his general statement about spontaneity by defining more closely the actual process of poetic inspiration. He says, "Poetry takes its origiu from emotions recollected in tranquillity : the emotion is contemplated till, by a species of reaction, the tranquillity gradually disappears and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced, and does itself actually exist in the mind " The process, it seems, has several stages—sensation, recollection and imaginative reproduction. It is in the second stage that Wordsworth has brought powerful feelings and tranquillity together by asserting the necessity of recollections as a link. It is indeed natural for a poet who has recounted his life in The Prelude that he should think of recollection as an indispensable part of the poetic process. The activity or passivity of this second stage is also a selective power and it is a slow growth. That is why the poet is but rarely able to make "a present joy the matter of a song " "Aubrey de Vere records a conversation which confirms Wordsworth's theory Wordsworth is reported to have said of a inferior descriptive poet : "He should have left his pencil behind and gone forth in a meditative spirit ; and on a later day, he should have embodied in verse, not all he had noted, but what he best remembered of the scene ; and he would then have presented us with its soul and not with the mere visual aspects of it". The method of recollection, Wordswoth believed, reproduced with deeper truth the original impression It implies that good poetry is never an immediate reaction to the provoking cause In the process of contempiation the sensations revive, and out of the union of the contemplating mind and the revived sensibility, rises the unique structure of experience which we call poetry The method of tranquillity is replaced by a re-creation of the primary emotion Creation begins Wordsworth, again, observes that in the process of composition the mind is on the whole in a state of enjoyment, and will reflect this state in the

an old man 'not all alive or dead.' The poet creates an awareness of more than what appears, Wordsworth endows the inanimate object with something approaching life and takes away from a living creature some of the qualities we associate with life and thereby he blurs the distinction between the living man and the inanimate objeet. "Imagination, he declares, "is ... that chemical faculty by which elements of the most different nature and distant origin are blended together into one harmonious and homogereous whole" In other words, imagination is the activity directed towards achieving a synthesis between disparate elements Wordsworth's definition, it may be noted with interest, is intimately reminiscent of Coleridge's idea of imagination as "the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities." Thus, the image of the leech-gatherer has been so modified by imagination that the b oundary between man and nature has been metaphorically denied. A deeper coherence has been achieved because the imagination accentuates the configurational pattern already present in nature. Wordsworth never affirms that the imagination works powerfully only when the feelings are violently stirred. There are several passages in The Prelude where this was the case But there is no evidence of violent emotion in Tintern Abbey, in The Solitary Reaper or the sonnets like To Toussaint L'Ouverture and On the Extinction of Venetian Republic. Wordsworth rather suggests that the product of the imagination is not necessarily accompanied by strong emotion, imaginature activity is possible only in a nature capable of deep feeling Again, he does not represent the imagination as working alone in the act of creation, He insists on the importance of social co operation and refuses to view the creativeness of the imagination as the activity of the isolated mind Imagination can only grow through the ministration of love and affection. He viewed the imagination not as a power divorced from the full activities of life but dependent on the responses that life awakens.

Shelley's thinkings on the matter are recorded in his Defence of Poetry and widely differ from the views of Wordswoth and Coleridge. In attributing to the poet the faculty of spontaneity and divine inspiration Shelley, no doubt, echoes Plato's ideas in Ion and Symposium Unequivocally does he assert : "Poetry redeems from decay the visitations of the divinity in man." But what he says, in a series of glowing images, to

When he woke up, the entire poem flashed in his mind – it was a very vivid and real experience to him. He snatched out a piece of paper and started writing. When he wrote down some sixty lines, someone knocked at the door The poet got up and opened the door and went out with him on business "On his return to his room, found to his no small surprise and mortification, that though he still retained some vague and dim recollection of the general purport of the vision, yet with the exception of some eight or ten scattered lines and images, all the rest had passed away like the images on the surface of a stream into which a stone has been cast, but alas! without the after restoration of the latter ____ Yet from the still surviving recollections in his mind, the Author has frequently propossd to finish for himself what had been originally, as it were, given to him __ but the to-morrow is yet to come" (Account of the author himself) Now, how can we explain the matter ? We might attempt to solve the mystery in the light of what Freud says on dreams To Freud, dreams are "the royal road to the interpretation of the unconscious. They provide one of the commonest outlets for tendencies that are repressed or unsatisfied in waking life." Now can we honestly believe that Kubla Khan was the outlet of the poet's repressed tendencies ? In fact, we cannot So the mystery remains. This inexplicability of the creative process is perhaps best emphasized by Alexander Dumas, the great French novelist of the nineteenth century. When asked by a curious reader how he wrote his finest siories Dumas replied in a nonchalant fashion : "Ask a plum tree how it produces plums." In this connection it would be interesting to point out how Carl Jung likens the creative process to dreams "A great work of art," Jung writes, "is like a dream " And he specifies two ways in which it is. "For all its apparent obviousness it does not explain itself and is never unequivocal." That is, the poem is not prescriptive, neither the poem nor even the dream says "you ought" or "This is the truth " Moreover, like the dream, the poem requires us to make our own interpretation, for the poem presents an image "in much the same way as nature allows a plant to grow, and we must draw our own conclusions."

It is perhaps T.S. Eliot who presented a tentative theory of the creative process in his seminal essay Tradition and the Individual Talent, although he is not even very sure of the relative importance of both the

These experiences are not 'recollected' and they finally unite in an atmosphere which is 'tranquil' only in that it is a passive attending upon the event." Eliot, however, admits that it is not quite the whole story. He admits that there is a great deal in the writing of poetry, which must be conscious and deliberate. "In fact, the bad poet," he says, "is usually unconscious where he ought to be conscious and conscious where he ought to be unconscious. Both errors tend to make him 'personal'. Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality."

We hope, we have established a sort of workable hypothesis of the creative process through this maze of conflicting theories and arguments, Yet not every stage, nor every detail of the process can be reduced to a set of formulae, for we must not lose sight of the fact that creation is intimately, nay, organically involved with the human mind. And the human mind can never be fully explored nor all the essential components of the conscious and the unconscious mind can be brought to light despite the best efforts of Sigmund Frend and Cart Jung One passing thought may be mentioned. Just to round off our analysis. It is surely a very disturbing thought Not many years ago (perhaps, as I remember, four years back) I stumbled upon an article in a British magazine, which contained a few specimans of poetry that came directly out of a computer, the author claimed. Those specimans, he suggested, can very well compete with some of the finest passages of Eliot's poetry. Now isn't this a very disquieting thought ? Days might not be far off when the human mind will no longer be indispensible in the act of creation. A machine will do what Shaeespeare or Dante, with their great minds took years to produce. We can only hope for the best. With a reverential awe at the man-made machine we may just pray and say 'Amen' !

নটিলাস-আঘাতের পূর্ব মুহূর্ত

দেবাশিস মজুমদার
৩য় বর্ষ (অনার্স : বাংলা পরীক্ষার্থী)

[সাবমেরিন নটিলাসের একটি প্রকোষ্ঠ, অধ্যাপক অ্যারোনা বসেছিলেন ;
এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমোর প্রবেশ]

নিমো ॥ সুপ্রভাত অধ্যাপক। আশা করি গতকালের দুঃস্বপ্ন ভুলতে পেরেছেন।

অ্যারোনা ॥ আমার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ থাকলেই ভোলা সম্ভব।

নিমো ॥ ও, অধ্যাপকের বিচারবুদ্ধিতে তাহলে ক্যাপ্টেন নিমো মানুষের পর্যায়ভুক্ত নয় বলতে হবে, কি বলুন।

অ্যারোনা ॥ আপনার সম্বন্ধে ঐ কথাটিই সবচেয়ে জোর দিয়ে বলা যায়। আপনি হয় অপদেবতা নাহলে অমানুষ। শেষেরটি হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা।

নিমো ॥ আপনার মুখের রক্তিম ভাব বলছে আপনি উত্তেজিত, নিন, চুরুট ধরুন। মিঠে তামাকের চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে ঝগড়া করা যাবে।

অ্যারোনা ॥ দিন, আপনার প্রতি আমার যে মনো ভাবই থাকুক না ওই দ্রব্যটিতে আমার একটুও অরুচি নেই।

নিমো ॥ শুনে আশ্চর্য হবেন এই তামাক আমি সংগ্রহ করেছি সেন্ট লুসিয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের তলদেশ থেকে।

অ্যারোনা ॥ আশ্চর্য ! বিশ্বাস করুন, হাভানায় ও এরকম মিঠে আমেজ পাইনি। সেন্ট লুসিয়ার মানুষ যদি একবার এ তামাকের সন্ধান পায় তাহলে এ তামাকের ব্যবসা করেই তারা বিরাট ধনী হতে পারবে।

নিমো ॥ কিন্তু তা তারা হবে না কারণ সমুদ্রের তলায় তারা কি করে পাবে আমার নটিলাসের মত অবাধ গতি আর খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা ? আর ঐ তামাকের জন্য একটা ছোট দেশ ধ্বংস হোক—এ আমি চাই না। অধ্যাপক, অবাক হচ্ছেন ? ঐ তামাকের মুনাফা লোটার জন্য সেন্ট লুসিয়া নামে একটা ছোট্ট ভূখণ্ডে লোভের দৃষ্টি পড়ত আপনাদের তথাকথিত সভ্যনামিক দেশগুলোর। আর মাংস ন্যায়ের বিরাট মাছটা যেমন চুনোপুটিকে অক্লেশে গিয়ে ফেলে, ঐ ছোট্ট দ্বীপটার স্বাধীনতার অমনি করে গ্রাস করত তারা।

নিমো ॥ অধ্যাপক অর্থ আমার অগাধ। আর সম্মান। ফরাসী দেশে যত মহাপুরুষের মূর্তি আছে তাদের কারো মাথাই ইফেল টাওয়ারের সমান নয়। ও সম্মান নয় অধ্যাপক, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কদিন বাদেই যা বাসি হয়ে যায়। কিন্তু প্যারিস শহরের বুকে যে বিশাল লৌহদানবটা মাথা তুলে আছে সেটার মত সভ্যতার দানব আজ মানবিকতার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথায় বাজ না হানলে সে বুঝবেনা তার বিপদসীমা কতটা ছাড়িয়েছে।

আ্যারোনা ॥ আপনি নিজেকে সভ্যতার দণ্ডদাতা ভাবেন ক্যাপ্টেন?

নিমো ॥ আমি দণ্ডদাতা নই অধ্যাপক। আমি ঘাতকমাত্র। ঈশ্বরই বিধানদাতা।

আ্যারোনা ॥ ঈশ্বর অত নিষ্ঠুর হলে, অত হিংস্র হলে তাঁর সৃষ্টির অভিপ্রায় মিছে হয়ে যায়।

নিমো ॥ তাঁর কি অভিপ্রায় ছিল আমি জানি না, তবে তাঁর কোন অভিপ্রায়ই যে সফল হয়নি তা আমি মর্মে মর্মে বুঝি। অধ্যাপক, সভ্যতা ধ্বংস হোক এ আমি চাইনে তবে তার সংস্কার আমি চাই।

আ্যারোনা ॥ আপনার উদ্দেশ্য যে ভ্রান্ত নয় এ বুঝলেন কি করে ক্যাপ্টেন?

নিমো ॥ আপনাদের সভ্যতা যখন কৃষ্ণকায় মানুষদের পিঠে চাবুক হেনে রক্ত ঝরায় দেশের মাটিতে আগুনে বোমা ফেলে শস্য খেতের শস্য নষ্ট করে, হীন ষড়যন্ত্রে ছোট দেশগুলোর মধ্যে হানাহানি বাধায় তখন আপনাদের মত পণ্ডিতদের চৈতন্যোদয় না হলেও ....

আ্যারোনা ॥ আপনি চুপ করে থাকতে পারেন না ...এই তো।

নিমো ॥ পারা উচিত নয়। অধ্যাপক, দু দুটো বিশ্বযুদ্ধে যারা মরেছে তারা কজন যুদ্ধ চেয়েছিল, বলতে পারেন?

আ্যারোনা ॥ যুদ্ধ না চাইলেও মরতে যে চায়নি এটা ঠিক। গতকাল যাদের সলিল সমাধি দিয়েছেন তারাও কেউ মৃত্যু চায়নি ক্যাপ্টেন।

নিমো ॥ এ নিছক মৃত্যু নয়, মৃত আত্মাকে সজোরে একটা আঘাত। বাইরের পৃথিবীর কাছে আমার নটিলাস অজানা একটা আতঙ্ক তাদের আচ্ছন্ন করেছে। সেই আতঙ্ক আর আঘাত দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলব সভ্য দেশগুলোকে আর সেই অস্থিরতায় জন্ম নেবে নানান বিশৃঙ্খলা। যুদ্ধ, বিপ্লব, সামরিক অভ্যুত্থান ক্ষমতার লড়াই। আর সেটাই নটিলাসের আক্রমণের স্থায়ী ফল।

অ্যারোনা ॥ তারা একত্রিত হয়ে নটিলাসের রহস্য খুঁজতে চেষ্টা করবেনা এ আপনি ভাবলেন কেমন করে ক্যাপ্টেন?

নিমো ॥ অধ্যাপক যতই উদ্যোগ চলুক সবকিছুর আড়ালে চলছে পরস্পরে প্রতি সন্দেহ। এ দেশ ভাবছে নটিলাসের আক্রমন ও দেশের কারসাজি, অন্য দেশটা ওই একই। সন্দেহ আর কোন দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। কিছু দিন বাদে এরও ফলশ্রুতি বুঝতে পারবেন।

ক'লকাতার জিরো আওয়ার

—অধ্যাপক উদয় ভানু ভট্টাচার্য

কিছুতেই কিছু করা গেলো না। ড্রাইভারের ওপর রাগ বাড়তে বাড়তে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো— যতবার বলছি আমার তাড়া আছে, এক্ষুনি পৌঁছেতে হবে—কথা যেন কানেই যাচ্ছে না—বারবারই এক একটা গলির মধ্যে ঢুকে, ডাঁয়ে বাঁয়ে দোকানদার, মুটে, ভিখিরী কাটিয়ে একটানা হর্ণ চেপে ধরে যতবার বড় রাস্তায় উঠতে যাচ্ছে—যতবার প্রমাণ করার চেষ্টা করছে আগের গলিটায় যাওয়া ঠিক হয়নি, এইটায় ফাঁকা মিলবে—ততবারই আমার দাঁত খিঁচুনি খাচ্ছে—"দেখলে কলকাতাটা আমি তোমার চেয়ে ভাল চিনি? - আমি আগেই বলেছিলাম নেতাজী সুভাষ দিয়ে বেরিয়ে ব্রেবোর্ণ ক্রস করে টানা বড়বাজার ঘুরে সোজা স্ট্র্যাণ্ড রোড়ে—

একটা প্রচণ্ড টানা হর্ণে আমার বাদ বাকী কথা শোনা গেলো না। পরমুহূর্তেই আমার চেয়ে দশগুণ দাঁত খিঁচিয়ে ড্রাইভার বললো—"সোজা স্ট্র্যাণ্ড রোড যাবেন তো—? সোজা—"

"তবে কি আমি ইয়ার্কি মারছি? —জানো একটু লেট হ'লে কত টাকার ক্ষতি—? একি! আর মাত্র দশ মিনিট আছে—ঘোরাও গাড়ি—নেতাজী সুভাষ রোড দিয়ে বেরিয়ে ব্রেবোর্ন ক্রস করে হ্যারিসনে প'ড়ে—"

'ব্যস্ ব্যস্ আর বলতে হবে না—চালাও সোজা নেতাজী সুভাষ—"

একটা তীব্র ঝাঁকুনি--ব্যাক গিয়ার—ডাঁয়ে হাত দেখিয়ে, বাঁয়ে কাটিয়ে, ট্রাম ড্রাইভারের খিস্তি খেয়ে ঠেলাওয়াকে ধমকিয়ে ট্যাক্সি নড়লো ড্রাইভার আবার চাঁচালো "চালাও সোজা নেতাজী "একি বিদ্রুপ করছে না কি? —না না ওতো পাঞ্জাবী - ওরা তো সিরিয়াস"—হ্যাঁ ঐ তো সিরিয়াসলি চেষ্টা করছে প্রতিমুহূর্তে ব্রেক কষে, পথচারীকে গালাগাল দিয়ে—হর্ণ হর্ণ-হর্ণ—এসে গেছে নেতাজী সুভাষ রোড। আর একটু—আর একটু গেলেই ব্রেবোর্ন রোড—ব্রেবোর্ন ক্রস করলেই—আর কয়েক গজ গেলেই পড়বে হ্যারিসন রোড—ওঃ আর মাত্র পাঁচ মিনিট—"ট্রেন ছাড়তে মাত্র পাঁচ মিনিট—মিঃ নায়ের এতক্ষণ নিশ্চয়ই ছট্‌ফট্‌ করছেন—রিসাভেশন চার্টের নীচে—তেমন তেমন দেখলে ট্যাক্সি নিয়েই ঢুকতে হবে প্ল্যাটফর্মে—তার মানে আবার পাঁচ টাকা ওঃ যদি এক মিনিট আগেও পৌঁছোয়—আর যদি না পারে—না হয়—? মাথার মধ্যেটা কি রকম করছে—অতগুলো টাকার চেক—মিঃ নায়ের রেডি করেই রাখবেন—আমি পৌঁছোবো, চেকটা হাতে দিয়েই রানিং ট্রেনে লাফিয়ে—

"দেখিয়ে সার"

আর সেই মুহূর্তে খটকা লাগলো, একি! সত্যিই সব থেমে গেলো কেন? একি! বৃষ্টি পড়ছে নিঃশব্দে—গাড়ীগুলোর ইঞ্জিন তো চলছিলো—থেমে গেলো? তবে কি সব তেল পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ? চারদিকের এত বিক্ষিপ্ত মানুষের সেইসব কোলাহল থেমে গলো কেন—? ঐ তো সব মানুষ ট্রাম বাস ছেড়ে দিয়ে ধীর পায়ে ভিজতে ভিজতে একটু একটু করে এগোচ্ছে—মানুষ নড়বার চেষ্টা করছে—এরা নিঃশব্দ কেন? —একি বীভৎস মৌন শবযাত্রা—চারপাশের আর সব শব্দ কই? সেইসব চিরপরিচিত দোকান বাজারের চেনা চেনা শব্দ? নাকি আমি আর কানে শুনতে পাচ্ছি না—ক'লকাতা মূক হয়ে গেছে না আমি বধির? —ওঃ গাড়ীর কাঁচগুলো তোলা—বৃষ্টির জন্যেই কখন অন্যমনস্ক হাতে তুলে দিয়েছি—

নাকি, আসলে আমি শব্দ শুনতে চাইছি না? —আমার ভালো লাগছে না? —কিন্তু এমনিতে কোলকাতার দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছুটি আমার তো ভালো লাগে—সকাল ৯টার স্বর্গীয় সাইরেন, মিনিবাসের ম্যারাথন—উল্লাসী হর্ণ, ভারী ডবলডেকারের চৌরঙ্গীর বুক চটকানো শব্দ—ঘাসের মাথা কেটে কেটে মসৃণ ট্রামের সাঁই সাঁই—ভবানীপুরের ভাঙা রাস্তায় অভ্যস্ত টেম্পোর হাঁপানী—কিম্বা কোন দোকানের রেডিওতে খেলার ধারা বিবরণী. সেই উন্মাদ চিৎকার স্রোত—হাওড়া ষ্টেশনের মহাযজ্ঞের সেই চিরপরিচিত নেপথ্য মহামন্ত্র এসব তো আমার চাই, প্রতিদিন চাই। আমি তো কখনও ভাবিনি এসব থেমে যাক ...আসলে এসব শব্দ তো কানের শব্দ, চলার শব্দ কলকাতার অজস্র মানুষের বেঁচে থাকার মিলিত শব্দ ব্রহ্ম। এতেই তো প্রাণ—কলকাতার সেই অন্তহীন প্রাণের দৌড় কোথায়? আজ চারপাশে আমার কেবলই থেমে থাকা—অথচ অনন্ত অর্থহীন শব্দ, আমার ভয় করে গা গুলোয়—তাই কাঁচ তুলে দিয়েছি—।

হ্যাঁ—আমি থেমে থাকা কোন কিছুর শব্দে ভয় পাই—হাসপাতালে আবছা আলোয় সারি সারি খাটের ওপর অনড় অচল রুগীর কাতরানি, ঘুপচি অন্ধকারে একদঙ্গল এলিয়ে পড়া মাতালের প্রলাপ, বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন স্তূপীকৃত মুমূর্ষুর গোঙানী এসব আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো—।

দুঃস্বপ্ন আমার এই চারপাশে থেমে থাকা অনন্ত গাড়ী আর মানুষের নিশ্চেষ্ট অপেক্ষা। এরা কোনোদিন কি নড়বে না? এতক্ষণ বারবার ঘাড় তুলে, মানুষকে জিজ্ঞেস করে খবর চেয়েছি মুক্তির উৎসমুখ ট্রাংক রোড হাওড়া ব্রীজ এ্যাপ্রোচের অবস্থা কি রকম—ক্রমশঃ সে উৎসাহও আর নেই—সিটে সম্পূর্ণ শরীর ছেড়ে দিয়ে একমনে সিগারেট টেনে চলেছি—দৃষ্টিকে গুটিয়ে ছোট্ট করে নিয়েছি—কাঁচ তোলা জানালা দিয়ে দেড়ফুট বাই দুফুট একফালি কলকাতা আমার চোখের সামনে—একটা ট্রাকের এক্সহষ্ট পাইপের মুখটুকু আর টায়ারের কিছুটা অংশ চাকা দুটোর গায়ের লেখা সব পড়া যাচ্ছে—বৃষ্টিতে ধুয়ে ধুয়ে চকচক করছে তার গায়ের কাটা কাটা দাগ—কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমিতো কখনো ডানলপের চাকা পড়িনি—ওতে এইসব কথা লেখা থাকে? —আসলে চাকা তো ঘোরে, তাই চোখে পড়ে না—এক্সহষ্ট পাইপটা এক নাগাড়ে ধোঁয়া ছেড়েযাচ্ছে মনে মনে একটা হিসেব

লোভে দোকান পাট বাজার থেকে কেউ বাইরে আসতে পারছে না, মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি, সিনেমার সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত্রের পরপর জমে ওঠা দর্শকেরা হল থেকে বেরোনোর, ঢোকার রাস্তা পাচ্ছে না, যারা লাইনে ছিলো তাদের পেছনে আগামী অনেক শো এর হিন্দী ফিল্মকামে জরজর দর্শক লাইন উপচে ফুটপাত, ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমেছিলো, তারা সব দলা পাকিয়ে মুজ কুজ বিকলাঙ্গের মত পরস্পর লেপ্টে একাকার, খেলার মাঠে গ্যালারীতে সেই কবে থেকে বসে থাকা অনন্ত মানুষের মাথা এখন আর নড়ে না চড়ে না, তারা জলে ভিজছে, রোদে শুকোচ্ছে। তাদের বেরোবার উপায় নেই, তাই মাঠের মধ্যেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই খেলা বারবার দেখানো হচ্ছে—অফিস থেকে বেরোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। পরের দিন এসে পড়েচে, সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়ছে—

ইতিমধ্যে কবে যেন ধীরে ধীরে রাস্তার জঞ্জালের স্তূপ একটু একটু করে বেড়ে বেড়ে এখন ডবল ডেকারের মাথা ছাড়িয়ে গেছে, কয়েক গজ অন্তর এইসব উচ্ছিষ্টের পাহাড় গাড়ীগুলোর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে দিতে চারধার থেকে তাদের ঘিরে ফেলবে—অজস্র পিরামিডের ছায়ায় ছায়ায় ডালহৌসী, চৌরঙ্গী সারকুলার রোড, রাসবিহারী বালিগঞ্জে এখন মৃত্যুর মত অন্ধকার পূতি গন্ধময় সেই সব টিলার মাথায় অজস্র গলিত কুকুর বেড়ালের মৃতদেহ, বাঁচার চেষ্টায় টিলা পার হতে গিয়ে কত মানুষ গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মরে মরে গড়িয়ে পড়েছে—

একি চারিদিকে এত ধুলোর গন্ধ কেন? কোথা থেকে আসে এ আকাশ অন্ধকরা ধূলোর ঝড়—ঐ তো ওদিকে গঙ্গার দিকে—ওকি! হাওড়া ব্রীজের নীচে দিয়ে গঙ্গা বইতো, সেই শীতল স্নেহের মত গঙ্গা—মুহূর্তে কে নেয় শুষে তার অনন্ত জলের ঢেউ—এখন তার লম্বা টানা বুকে যেদিকে তাকাও শুধু বালি বালি ধূলো—দুপাশে ভাঙাচোরা দুমড়োনো নৌকোর হাল, গলুই কঙ্কালের মত পড়ে—বিশাল বিশাল জাহাজ বিবর্ণ রংটা হয়ে উল্টে রয়েছে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে—চারিদিকে শালপাতা উড়ছে, দাঁড়কাকের দল সব খানে ওখানে বীভৎস উল্লাসে চিৎকার করছে—শকুনির পাল ক্রমশঃ বড় হয়ে হয়ে নেমে আসছে—ঐ তো তাদের নোখ, চোখ, ঠোঁট পরিষ্কার হচ্ছে—তাদের দৃষ্টিতে এখন নীচে পড়ে থাকা বিশাল কলকাতার মৃতদেহ ··

একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় সমস্ত কলকাতা থরথর কেঁপে উঠলো আমি পরিষ্কার দেখলাম হাজার হাজার নড়বড়ে হল্‌দে হল্‌দে ছাপধরা বাড়ির সব এদিক সেদিক নুয়ে, হেলে, হুড়মুড় করে যেখানে যেভাবে পারলো পড়তে পড়তে আটকে গেলো—পড়ার জায়গা নেই। হাওয়ার দাপটে রাস্তার ধারে ধারে ল্যাম্পপোষ্ট মুচকে উপড়ে এদিক সেদিক হেলান দিলো—বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনেরা দুমড়ে মুচড়ে ছত্রাকার—

আমি কম্পিত বক্ষে বোবা কান্নায় আকুলভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম "রক্ষা কর প্রভু—কলকাতাকে মেরো না—কলকাতা আমার ইহকাল পরকাল"।

সে এবং মানসী

—গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(প্রাক্তন ছাত্র)

অরিজিৎ প্রেস থেকে বেরিয়ে হাঁটছিল।

হলো না। এবারেও ওর লেখা অশনি পত্রিকার পছন্দ হ'ল না। সহ সম্পাদক খোকাবাবু তিনবার নাক কুঁচকে চোখের মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা ওই তালে নাচিয়ে নিয়ে ভ্রুকুটি করে বললেন, লেখাটা হয়েছে বটে, তবে তেমন না। আপনি জমা দেবার সময় যা বলেছিলেন, মনে হ'ল মালমশলা অনেক কিন্তু কোথায় ভাই ভয়ানক বেশী এ্যাব্‌ষ্ট্রাকট্‌ হয়েছে, সাধারণ মানুষকে বুঝতে দিন জানতে দিন—মাটির কথা, মনের কথা, সংসারের কথা এসব দিন। অরিজিৎ তবু কৃত্রিমভাবে বিনয়ীর মত হাসল, সেই কথা বলারই চেষ্টা করেছি, একটু ভালো করে পড়ে দেখুন। না মানে একটা চান্সও হবে না। —আরে মশায় অশনি পত্রিকার একটা অ্যারেষ্ট্রোকেসী আছে তো, লেখা তো লিখব বললেই লেখা যায়, ছাপাব বল্লেই ছাপান যায়, কিন্তু মশায় নামী দামী লেখকদের পাশে কি যাতা একটা আপনিই বলুন না বিরিয়ানীর পাশে কি ফ্যান্‌ভাত ভালো লাগে, বুঝেছেন, কর্মার্শিয়াল যুগ, একটু sex জাতীয় ছোঁয়াতো রাখতেই হয়, নাহলে পত্রিকার চাহিদা হবে কেন। বেশ, কিছু দরকার নেই আপনি পাকাপোক্তভাবে এক তরুণ-তরুণীর অবৈধ প্রণয় নিয়ে একটা গপ্পো বানিয়ে শেষে একটু political touch দিয়ে দিন, লেখাটা আমি সংস্কার করে বার করে দেব।

অরিজিৎ এরপর আর হাসতে পারেনি, ধন্যবাদ বলে বেরিয়ে পড়েছিল, নিজেকে এ মুহূর্তে ওর খুব ছোট লাগছিল। অরিজিৎ ক্লান্তভাবে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাত দুটো মাথার উপর ভাজ করে দুবার তুললো, নামাল আবার হাঁই তুললো। হঠাৎ মনে হলো সে হেরে গেছে competition market এর পাশে সে পড়ে গেছে, এ পথে হাঁটার ক্ষমতা আজো সে বোধহয় পায়নি। অদ্ভুত, সেক্স নিয়ে গল্প, প্রণয় দিয়ে বিকৃত প্রবন্ধ আর তাতেই আজ সাহিত্য। মনে পড়ে ক'দিন আগে বোধ হয় একজন দামী লেখকের লেখা পড়েছিল তাতেই শুধু ওই চেহারা পাহাড়ের ওপর নির্জন পরিবেশে একটা কাঁচা ঘরে তিনটে মানুষ, একটি দম্পতি ও একটি যুবক। স্বামী ব্যক্তি স্ত্রীর কাছে কেমন ম্যাদা মারা অক্ষম; তাই স্ত্রীর সংগে যুবকের অবৈধ প্রেম, প্রণয়ে সঙ্গীসুখ। যাকে বলে বাঁশি খেলান সুরে সাপিনীর সঙ্গে সহবাস, একটা অনাবিল তৃপ্তি আর স্বর্গসুখ। এর মধ্যেও যেন কিসের একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার। এই হল আজকের আর এক শ্রেণীর উপন্যাস। অর্ঘ সেও তো অরিজিতের সমবয়সী

তার একনিষ্ঠ ভক্তকে ছুটতে হবে অনেক অনেক দূরে। একটু আকাশ একটু মাটি ছুটতে ছুটতে সে ক্লান্ত হবে, প্রচণ্ড দেওয়ালের ধাক্কায় হয়তো তার শ্বাসরোধ হয়ে আসবে, প্রেম কাঁচের বাসনের মত ভেঙে যাবে। স্বপ্ন ভেঙে জীবনের তিক্ততা আসবে। যান্ত্রিক জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস। সবুজের প্রকৃতি বোধহয় সেদিন আদর্শের একদেহে ম্লান হয়ে যাবে। তখন থাকবে না সবুজ, থাকবে না আদর্শ। থাকবে অশ্লীলতা, যান্ত্রিক নিয়মে গড়া এই নগ্ন শহর আর সমাজ।

অরিজিতের চোখের সামনে রাস্তার নিয়ন লাইটগুলো বিদ্যুৎস্পর্শে ঝলসে উঠবে। সমস্ত শহরটা যান্ত্রিক নিয়মে ঠক্ ঠক্ শব্দে ছন্দ পতন হয়ে বয়ে চলবে। জ্বলবে ইমিটেশনের চকচকি, কি বীভৎস দৃশ্য।

অরিজিতের মানসীর ঢলঢলে মুখটা কেমন শুকিয়ে যাবে, অনাহারে শীর্ণতায় মুখের আদলটা পাল্টে যাবে। ভিটামিন দিয়ে আজ আর তাকে ভরাট করা যাবে না; রঙের প্রলেপ দিয়ে সৌন্দর্য ফেরান যাবে না; তখন সাহিত্যের মানসী ঝলসে যাবে। মানসী বলবে, যে সে মেকী, ভীষন মেকী, ভীষন মেফী। ব্যবসার যুগ এটা, এ সব কিছুই কর্মাশিয়াল মেথড।

সেদিন হয়তো শহরের খুপরী ঘরগুলোতে পোষাকী নর নারীর সংখ্যা বাড়বে। নগ্নতার রূপ সেদিন এই শহর কামিনী তার নগ্নরূপে উল্লাসের হাসি হাসবে, দিবানাথের মত হাজারো মানুষ সেদিন ভয় পাবে এ যে কঙ্কাল।

তখন হয়তো নোতুন বস্ত্র নিয়ে লক্ষ মানুষের মিছিল বেরবে, শোষিত, নিঃষ্পেষিত মানুষের মিছিল, তারা কাপড় পড়িয়ে তার রূপ ঢাকবে, বলবে, 'ভোরের ওই সূর্য আলো দাও'। অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে সেই সংগ্রাম, শোষনের বিপ্লবে।

সেদিন মানুষ অপ সংস্কৃতির চাপে নুয়ে পড়ে আর্তস্বরে চিৎকার করবে, আমরা বাঁচতে চাই। আর ওই কৃপাময় সেনরা তখনও পর্য্যন্ত চোখে রঙিন চশমা এঁটে বলবে, এটাই ইন্‌টেলেকচুয়াল এ্যাডাপ্‌টেশন্।

একটা বইএর দোকান সেখানে কত বই। অরিজিৎ লেখক। অরিজিতের উপন্যাস, অরিজিতের প্রবন্ধ পাঠক পড়ছে। কিছু ঘন ঘন সংস্করন বার হচ্ছে না। কৃপাময় সেনরা তাই বলছেন, ওর লেখার বাঁধুনি নেই, ওর প্রকাশ ভঙ্গী নেই, He knows nothing about commercial method. সত্তরজন কৃপাময় সেনের হলেও হয়তো সেদিন ত্রিশজন পাঠক স্বীকার করবে অরিজিত লেখক, অরিজিত জীবনকে চেনে, সমাজকে চেনে। সেদিন মানুষের যন্ত্রনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যেই অরিজিতের লেখা হয়ে উঠবে সার্থক। এমন কতকগুলো অনুভূতি নিয়ে অরিজিৎ চিৎকার করে উঠলো, পারবো আমি পারবো, I must, I must do this কৃপাময় সেনরা সেদিন তাদের সাহিত্যের ধারাকে পাল্টাতে বাধ্য হবেন।

অরিজিত মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো। এটুকু জানবে তোমার কাছে যা সত্যি, তাকে লিখেই

MATTER

Sri Subhas Ch. Nath,
Dept. of Philosophy, Year—II

Our common-sense says that objects around us, even our own bodies, are material. Tables, Chairs, Water, etc, are different items of matter. The term 'material' implies that 'matter' is some unique ultimate principle of the world. Matter is that which is common to these things and though the things change, their stuff, matter, does not. But divisibility and diversity among material objects lead us to conceive that matter is granular in structure and complex in nature rather than a unity Thus we are to face the questions : Is matter coutinuous or discrete? and is matter one or many ?

Philosophical interpretation of such diversity is due to the various manifestations of the 'unique' matter. Matter is an abstract term,—a convenient term which scientists and philosophers alike use to apply to the stuff of all objects, which we can touch, hold, see, etc. ; but we cannot experience 'matter' itself Matter is considered to be more real in a sense than those objects. Science and common-sense do not question the existence of matter. Matter is a matter of experience But some philosophers, Berkeley, for example, even doubts its very existence as an independent reality.

The early Greek views of matter were vague and largely guesses. Some Greek philosophers like Thales, Anaximenes, Heroclitus etc. interpreted the world as an outcome of water, air and fire respectively, i.e. according to them matter is water, air and fire respectively taken in order. Sometime later Empedocles took analytical view and came to the conclusion that all physical objects are composed of four primary elements—air, fire, water and earth So that Empedocles' answer to our second question is 'many' and it is four, i.e. there are four different types of matter as they are called above. Still later, Democritus proposed that the world was composed of an infinite number of atoms which are infinitely small and

physicists like Rutherford, Bohr, Millikan, Planck etc. According to modern chemists, physical objects are made of molecules and molecules are made of atoms. These atoms are indivisible and infinitely small units.

Tnere are several distinct classes of atoms and each class is called an element. There are 92 principal elements, e.g. carbon oxygen, calcium, mercury etc and objects are composed of them as compounds. A chemical scientist elucidates the diversity in physical objects in terms of the composing elements, their number and their relative arrangement Water, for instance, is composed of hydrogen and oxygen atoms organised in a specific pattern, Whereas, alcohols is composed of carbon, hydrogen and oxygen. Water and alcohol differ from each other because of their composing elements. Gold ornaments differ from silver ornaments because they are made of gold and silver atoms respectively and gold atoms differ from silver atoms essentially. Again, charcoal and diamond are physically. different, but both are composed of the same carbon atoms bnt in different organisation.

Until Becquerel's discovery of radioactivity, atoms were considered as indivisible, but as soon as the spontaneous and self-decaying activity of Uranium atoms was known, the theory of indivisibility of atoms was discarded. Decay results in the form of an emission consisting of alpha, beta, and gamma rays. These rays are examined under steady electric and magnetic fields. The alpha and the beta rays are found to be oppositely charged particles. The gamma rays are indentified as very short electro-magnetic waves. Alpha, beta and gamma rays come out of radioactive atoms (i.e which exhibit radioactivity). These are, therefore, made, in part, at least of these rays. That is, atoms contain, positive and negative particles and some energy, which bind together these particles. This energy, is released when their bonds break and this is what is called the decay of atom. Further investigation on alpha and beta rays reveals that beta rays consists of negatively charged particles. J. J. Thomson called them electrons. These electrons are found to be no more divisible. On the other hand alpha rays are found to consist of two types of particles : proton and neutron Protons are positively charged particles, while neutrons are neutral in charge. An electron and a proton carry charges of mutually opposite quality. Therefore, atoms contain electron, proton and neutron They

where, y = is the wavelength of the associated wave and h—Planck's constant.

Another step beyond the classical Physics was taken by Planck. He proposed, in 1901, that the energy exchange could take place only discontinuously and discretely, always as integral multiples of a small unit of energy called quantum. Following Planck, Einstein in 1905 proposed that electromagnetic waves might behave like material particle and thus he interpreted the photoelectric and campton effects, which were uninterpretable by wave theory of radiation. Thus we see matter has energy aspect and vice versa.

In classical Physics 'mass' of a body is supposed to be a constant quantity but the theory of relativity (proposed by Einstein) concludes that mass of a body varies with its velocity with respect to the observer it is given by,

$$m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

where, m_o = mass of the body measured by the observer when it is at rest and m = mass of the same when moving with the velocity u. Such variation of mass with velocity was experimentally verified by Koufmann, Bucherer, Guye, Lavanchy on high speed electrons. Thus, our previous concept, i.e. mass = quantity of matter, is no longer tenable.

According to this theory, a bird or a rocket as moving in the sky accumulates mass out of nothing. Hence, matter is no more matter in its original sense. Matter is an appearance rather than reality which is supposed to be independent of our experience. The appearance of matter is modified under different conditions That is, original matter is dematerialised by Einstein. Again, from the theory of relalivity, it follows that there is a universal relation between 'mass' and energy', given by : $E = mc_2$. i.e. a bulk of matter of mass 'm' can be totally converted into energy of amount 'E' where 'C' is the velocity of light. When a body is under m tion acquires some Kinetic energy. And a moving body may be reduced to energy of an amount equals to the sum of its stored internal energy and the Kinetic energy The stored internal energy is defined as due to the rest mass of the body (i.e. = $m_o c_2$). The mutual conversion of mass and energy has been verified by physicist for all forms of energy. There are

ledge rests on an unsure basis The history of scientific knowledge is, in part, at least, the history of the gradual falsification of hitherto established 'scientific' truths. Science moves within its own limitation; scientific knowledge is subject to certain conditions. The perceiving subject, the perspective, the method of observation and many others condition our knowledge The real nature of the stuff can be had, if at all, only when we have access to it unconditionally. Perhaps a rishi or yogin can say what it is like.

Education is the manifestation of perfection that is already in man.

VIVEKANANDA

দুটি কবিতা

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র

বারবার প্রান্তিক প্রদেশে চেয়েছিলে তুমি
ফিরে যেতে মা'য়ের স্তনেতে
যেখানে উঠান জুড়ে পড়ে থাক
শীতের রদ্দুর

তার পাশে ঝেড়ে ফেলা খুদ-খড়-কুটো
অবহেলে খেয়ে যাক অচেনা পাখিরা
বারবার চেয়েছিলে ফিরে যেতে মা'য়ের জঠরে
অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বারবার চেয়েছিলে তুমি
একান্তে আলোর ছোঁয়া মনে

বারবার চেয়েছিলে ফিরে যেতে শব্দের নাভি স্থলে
সেখানে অনাঘ্রাত শব্দেরা পড়ে আছে ফোটার আশায়
সেইসব শব্দকণা নিয়ে
তোমার প্রেয়সী পাক অন্য কোনো ছন্দময় ভাষা
- বারবার চেয়েছিলে তুমি—
বারবার চেয়েছিলে
তোমার প্রিয়ার দেহে
নতুন কবিতা লিখে যেতে

বারবার চেয়েছিলে, কর্ষিত প্রান্তর জুড়ে পড়ে থাক ফলন্ত আশা
তোমার প্রিয়ার চোখে জুড়ে অষ্টম রঙ
সে রঙের তুলি দিয়ে
পৃথিবীর অসমাপ্ত ছবি—
একবার সম্পূর্ণতা পাক
বারবার চেয়েছিলে প্রান্তবর্ত্তী পাহাড়ের নীচে

কলকাতা এবং তার মানুষজন

দেবাশিস মজুমদার

তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক – বাংলা

খুব কি বদলাচ্ছে কলকাতা ? টের পাই না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় কোথায় যেন একটা ব্যবধান তৈরী হচ্ছে । সরাসরি মনের মধ্যে কলকাতা ঢুকে পড়তে পারছে না যেমন আগে আগে পারত। আগে আগে কলকাতার সব সকাল, সব দুপুর, সব বিকেলের মধ্যে আত্মীয় পরিজনের মতো গন্ধ লেগে থাকত। দুর্দান্ত ছিল সেই সব নসট্যালজিক ভাবনার মতো আহ্বান। এখন কেবল শত্রু পক্ষের আক্রমণ। সেই আক্রমণ গতানুগতিকার মধ্যে দিয়ে। সেই আক্রমন কলকাতার মানুষদের পরিবর্তন হওয়া নিয়ে। পরিবর্তনটা কোথায় ? ভেতরে না বাইরে ? এভাবে প্রশ্ন করলে সঠিক জবাব মেলে কিনা অজ্ঞাত। তবে নিজের দেখাশুনা থেকে বলতে পারি লোকের ধ্যান ধারণায় রকমফের ঘটছে। আবার একটা জিজ্ঞাসার মধ্যে পড়ে যেতে হয় কলকাতার মানুষজন কিভাবে তারা ঘুঁটি সরাচ্ছে ? কিম্বা প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরকর্তা প্রায় একই বিন্দুতে বিচরণ শীল। ঘুঁটিটা সরে হয়তো এইভাবে—হৃদয় ভাঙতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বোধ—দুটোর মধ্যে কলকাতার মানুষজন বদলাচ্ছে। নিজেরই ক্যানভাসে নিজের ছবি দেখছে, নিজের নিঃসঙ্গতায় নির্জনতায় কষ্ট পাচ্ছে ; আবার নিজেরই তৈরী করা রোমান্টিকতায় কাবু করছে : তিলধারণ মানুষের মতন ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে আবার রাত্রে ভাবালু হয়ে রবীন্দ্র সংগীত শুনছে। সঠিকভাবে দেখতে গেলে ব্যাপার গুলি ঐ হৃদয়ভাঙা এবং বোধের মধ্যে দিয়ে ঘটছে জানি না একসূত্রে বাঁধা আছে কি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এইসব ব্যাপারগুলির সঙ্গে আপগতভাবে মনে হয় প্রকৃতির সঙ্গে একটা সংযোগ রয়েছে। এবারে একটা অবিশ্বাস জন্মায়। কলকাতায় কি সত্যিই প্রকৃতি আসে ? মানুষজন বর্ষার গান শুনে উল্লসিত হয় অথবা বসন্তের কবিতা পড়ে ? সংশয়ের মধ্যে থেকে মনে হয় কলকাতার মানুষজন বড়ো অদ্ভূত বড়ো নৈর্ব্যক্তিক। কেবলই ঘুঁটি সরাছে। সরাতে সরাতে কোথায় পৌছবে অজানা। তবে কোথাও এমন একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। অথচ ঘটছে পুনরাবৃত্তি। ঘটছে না বরং বলা উচিত ঘটানো হচ্ছে। কলকাতার মানুষজন তাহলেই ঐ আক্রমণের সম্মুখীন। এর পরিণতি কি বিপজ্জনক ? অবশ্য এই বিশ্বাসের পেছনে রয়ে যায় উদ্দাম উন্নাসিকতা। আবার বলতে হয় কলকাতার মানুষজনের তুলনা মানুষজন নিজেই। নিজের তৈরী করা ঘরের মধ্যে বাস, নিজের তৈরী করা ভাবনা চিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া—এইসব নিয়েই কলকাতার মানুষজন বেঁচে আছে। কতদিন থাকবে জানি না।

চর্ব্য চোষ্য দিয়ে আহারে ব্যস্ত। প্রগতির এটাই কি অনন্তা একটা ছবি? সাম্য কি আংশিক সফলকাম? আমরা যতই বড় বড় কথা বলি না কেন ভুলেও ভাবি কি এদের প্রকৃত ছবিকে?

আমরা তথাকথিত সভ্য মানুষ। এটাই বড়াই করে বলে বেড়াই. কিন্তু ভেবে কি দেখি কাদের জোরে আমাদের এই সভ্যতা। কাদের শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আধুনিক বিংশ শতকের সভ্যতা? কাদের পাঁজরের স্তূপে, স্তূপে গড়ে উঠেছে তথাকথিত সভ্যতার নির্দশনরূপ আকাশচুম্বী অট্টালিকা? কাদের শ্রমরূপ রুধিরে চালাই আমরা আমাদের মোটর গাড়ী? আমরা জানি না। বিশেষ করে জানবার চেষ্টা করিনা ইচ্ছে ক'রে। আর আনন্দের কথা কি আমরা ভুলে যাই আমাদের সমস্ত কিছু সভ্যতার নিদর্শনের উৎপাদনের স্রষ্টাদের কথা। ভুলে যদি যাই হয়তো ভুলি কোন স্বার্থসাধনে। লংকায় যেই যায় সেই হয় রাবন। মনে হয় আমাদের দেশে তাইই হয়েছে। লংকারূপ ভদ্র মঞ্চে যখনই বসি তখন কি আর মনে থাকে ঐসব "ছোট লোক", অশিক্ষিত, নীচে চাষা জুতো, কামায় কুমোর, ছেলে, নাপিত হরিজনদের কথা। আর কি করেই বুঝব? বড় পাশে বাড়ীতে আমাদের জন্ম। বলতে গেলে কি 'সোনার চামচ' নিয়েই এসেছি এই পৃথিবীতে। কি করেই বা অনুভব করব দারিদ্রোয় তীব্র কশাঘাত! এই আমরা সচিব সম্প্রদায় চিরদিনেই ভাল খেয়ে, পরে, আর জনগণের উপর খবরদারি করে এত দিন চালিয়ে এলাম কি ক'রেই বা বুঝব দারিদ্র্যের কথা বা জ্বালা! না বাবা, আমাদের কোন দোষ নেই। কারণ ঈশ্বর নামে পরম পিতা, যিনি ঐ শূদ্র সম্প্রদায়ের ধর্ম পিতা নন কেবলই আমাদের, কেবল ভোগ করিতেই পৃথিবীতে আমাদের পাঠিয়েছেন। তাতে আমাদের কি দোষ?

সেই একটা গল্পে আছে না. "কোন এক ব্রাহ্মণ যখনই একটি নিদিষ্ট মঞ্চে আরোহণ করিয়া শস্যক্ষেত্রে বিতাড়ন করিত তখনই তাহার হৃদয়ে দান ধ্যানে বাসনা জন্মাইত, আর যখন নামিয়া আসিত তখন সে পূর্ব কথা বিস্মৃত হইয়া কৃপণ হইয়া যাইত"। আমরা এই ক্ষমতা বানগোষ্ঠী কি তাই নষ্ট? কারণ যখন আমরা ক্ষমতায় বসি তখন আর ঐসব হরিজনদের কথা আমাদের মনে থাকার প্রয়োজন বোধ করি না। আবার যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যায় তখন ভোটের ঝুলি নিয়ে ঐ সম্প্রদায়দের দরজায় আনাগোনা করি। দুঃখে আমরা বিগলিত হই॥

তাই প্রশ্ন যাদের রক্তমাংসের বিনিময়ে আমাদের দৈনন্দিন ভোগ বিলাসের সামগ্রী যোগাড় করি তাদের কথা কি কোনকালেও ভাবব না? তাদের অবস্থার উন্নতির দিকে কি দৃষ্টিপাত করব না? জানি না এদের দু'চোখে কবে কান্নার পরিবর্তে হাসির ফুল ফুটবে। ওদের পেটে কবে থাকবে অন্ন। উঠবে নতুন নতুন কাপড়—তাও জানি না। ... ...।

নিরক্ষরতা দূরীকরন ও ছাত্র সমাজের দায়িত্ব

গৌরী শঙ্কর ভাণ্ডারী
৩য় বর্ষ, সাম্মানিক অর্থনীতি

"নিরক্ষরতা দূরীকরণ" এক কথায় স্বাক্ষরতা করা, আমাদের দেশে বর্ণ চেনাকে যদি স্বাক্ষরতা বলা হয় তবে দেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ লোক নিরক্ষরতার আওয়তায় পড়বে। কিন্তু এই স্বারক্ষরতা পিছনের ছাত্র সমাজের কিছু কি দায়িত আছে, যদি থাকে তাহলে ছাত্র সমাজ কিভাবে তা পালন করবে।

আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ শতাংশ লোকের গ্রামে বাস, গ্রামের অধিকাংশ লোকের জীবিকা নির্বাহ হয় কৃষিকার্যের মাধ্যমে। তাই লেখা পড়ার দিকে প্রথম থেকেই একটু অবহেলা গ্রামের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু আজ দেশের যত কিছু সমস্যা এই অশিক্ষিত লোকগুলিকে নিয়ে. উন্নত দেশের উন্নত প্রথায় সব কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় কি কৃষিকার্যা, কি লেখাপড়া, কি যন্ত্রপাতি শিক্ষা।

তাই দেশের বিরাট অনগ্রসর জনসমাজকে স্বাক্ষর করিতে সবকার শুধু সচেষ্ট হলেই হবে না। সরকারী মহলে টাকা পয়সার ভিত্তিতে এই প্রয়োজনের তুলনায় কমই সাহায্য হয়।

দেশের বিরাট ক্ষমতা এই ছাত্র সমাজের উপর ন্যস্ত। ভাবী কালের নাগরিক হিসাবে যেমন তেমনি সমাজকে সুশৃঙ্খল স্বাভাবিক করার, যে সমাজে বিরাটাকার অংশ অশিক্ষিত ভাবীকালের নাগরিক হিসাবে তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে ছাত্রদের, তাই ছাত্ররা যদি বর্তমানে সামান্ত স্বার্থ ত্যাগ করে অশিক্ষিত সমাজকে স্বাক্ষরতার পথে এগিয়ে আনে. তাহলে যে সমস্ত লোক উপকৃত হোল— তাদের বংশধর তাদের চাইতে কিছুটা বেশী শিক্ষিত হবে ইহা সাধারণের ধারণা। আমাদের দেশের রীতিনীতি ছিল অশিক্ষিতরাই কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিবে। কিন্তু আমাদের যে চেতনা ক্রমে ক্রমে বিলীন হচ্ছে- উন্নত দেশের চালচলন দেখে।

ছাত্র সমাজের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত, তারা যখন তা পালন করবে - এই নিয়ে বিশেষজ্ঞের মধ্যে আলোচনা হয় গ্রীষ্মের অবকাশ বা পূজার ছুটি অথবা পরীক্ষার দেওয়ার পর ছাত্ররা এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমাদের গ্রাম প্রধান দেশে. গ্রামের কৃষকেরা চাষবাসের পরে সন্ধ্যার সময় অবসর জীবন যাপন করে। তখন যদি ছাত্ররা গ্রামের নৈশ বিদ্যালয় খুলে তাহাদের স্বাক্ষরতা দেবার চেষ্টা করেন তাহলে তাহাদের কর্তব্য কতক পরিমাণে পালন করা হবে।

INTER-Disciplinary DIALOGUE

Kalipada Baksi,
Dept. of Philosophy

(I)

In the present era of specialisation the need for inter-disciplinaay dialogue is likely to be felt more urgent. The more we specialise in one branch of knowledge the more do we require to communicate with other branches. The success of a community project, for instance, be it municipal or international—depends much on the co-operation of a number of disciplines related to it. Partial failure of the schemes executed in India like that of education or rural electrification, for example, is, in part, due to this lack of comprehension. There is no denying that, at present, co-operation between diciplines is being sought more and more increasingly. But, perhaps, we are not as yet very clear about certain fundamental issues involved in the very notion of 'inter-disciplinary dialogue'. In this short paper I would like to put forward a brief sketch of the issues.

In order that two distinct disciplines may be considered relevant to each other we are required to understand at least three things. These are the presuppositions points of view, and purposes of the disciplines concerned Effetive dialogue between disciplines, so very keenly felt now-a-days, depends much on these factors.

(II)

Presupposition : Most intellectual pursuits- possibly all-begin with certain presuppositions Generally speaking, natural sciences take it for granted that any possible object of 'experience' must have some physical properties. Physical properties are described in terms of weight, magnitude, location, measurability etc But some disciplines the Nyaya or Russell's Lagical Atomism, for instance, confer upon 'experience' a more extensive role Many of the items such as universals or negative facts (objects), that fall within the range of their (Russell's or Naiyayika's) experience, are, in principle, beyond the reach of the physicists. This shows that disciplines

we discourse with others we do not always stick to all the restrictions which we had assumed at the outset But we do not usually give up all those conditions and resort to totally new ones Generally speaking, the set of conditions that are least likely to be given up by us forms the presuppositions of the discourse The new conditions that we might adopt or the old ones that we might surrender with any change in our interest in the object of our study, are matters pertaining to points of view.

The categories of some one discipline may vary so widely from some other that it may not be possible to establish any communicable link between them. This would yield mutually closed worlds Dialogue between systems would be possible if the categories of one system are, in some sense, reducible to those of the other ; or, both sets of categories are reducible to a third common set. The programme of the positivsts to devise a universal language, a language into which the sentences of different scienees—physical as well as biological—may be translated, represents this line of approach.

Even if this demand for reduction cannot be strictly met, the prospect of inter-systemic dialogue may not be compietely blocked. If the systems concerned agrees in their basic presuppositions, an intercourse between them may be made possible ; and more so, if the systems pursue the same objective.

4. Purpose Every discipline has a purpose Co-operation between disciplines cannot go far if they differ in their purposes. Education, as it was designed by the British rulers in India, to cite an instance, aimed at creating a class of people who would look into British interests in the country. Some of these people belonged to the specially priviledged group called 'Civil Servants', enjoying special powers and commanding high prestige in the society Whatever changes there have been in the educational policy, education, particularly in the higher level, still continues to create aspirations commensurate with the privileged society ; though, it has yielded many other consequences as well. Setting up of new universities of the common sort to foster what may be called 'higher education in a mass scale', when the village population cannot yet recognise alphabets, or the installation of TV plants when 90% of the rural areas lack electricity (or even food), point at the basic disparity between the purposes of

বন—জ্যোৎস্না

মানস ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র

মাদাম জুলি রুবের নিজের ঘরে বসে ছিলেন তাঁর দিদির জন্য। আজ তাঁর দিদি আসবেন —অন্ততঃ সে রকম কথাই আছে। মাদাম হেনরিয়েতা লাতোর প্রায় মাসখানেক সুইজারল্যাণ্ড বেড়িয়ে আজ ফিরছেন ছোট বোনটির কাছে।

রাত হল, বৈঠকখানার ঘর জুড়ে জ্যোৎস্না তার এলায়িত কেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। চুপ করে ঐ ঘরের এক প্রান্তে সোফায় বসে আছেন জুলি। তাঁর সমস্ত মুখে একটা ব্যাকুলতার ছাপ। 'দিদি কি তবে আসবে না'। হঠাৎ সদরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে তিনি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। হেনরি শেষ পর্যন্ত এলেন তাঁর পরণে ছিল একটা লম্বা পোষাক, সমস্ত দেহ শুধু মুখটি এবং পা দুটি ছাড়া ঢাকা রয়েছে ঐ পোষাকটি দিয়ে।

কোন রকম লৌকিকতার বন্ধনে নিজেদের না বেঁধে দুটি বোনের বহুদিনের বিচ্ছিন্নতা দুটি হৃদয়ের নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়িল। যুবতী রাত্রি এখন প্রবীণা হতে চলেছে। জুলি ঘন্টা বাজিয়ে তাঁর ভৃত্যকে ডাকলেন একটি বাতি রেখে যাবার জন্য। অনেকদিন দিদিকে দেখেন নি জুলি। ভাল করে দেখবার জন্য ভৃত্যটির এনে দেওয়া সেই বাতিটি উঁচু করে হেনরির মুখের উপর তুলে ধরলেন জুলি। হঠাৎ সেই মুখের উপর যেন তিনি অন্য কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলেন। এই অন্য কিছুটি কি পাঠক ক্ষমা করলেন, আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। আপনারা পাঠক। পৃথিবীর পাঁচটা সাহিত্যের সঙ্গে আপনাদের আলাপ আছে আপনারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারবেন। আর সাহিত্যে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে এবং ঘটে থাকে যাকে কোন নামের সংজ্ঞায় ধরা যায় না—অন্ধকারের ভেতর অন্ধকারের নিজস্ব যেমন একটি আলো আছে, তাতেই যেমন তার দীপ্তি, তেমনি অন্ধকার হৃদয়ের আলো দিয়ে একে আপনারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। গোপনীয়তাই এর একমাত্র সত্তা, সে রকম গোপন করে তাকে আপনারা বুঝবেন।

যাক যা বলছিলাম। জুলির ঐ বিস্ময়ের কারণটা কী জানেন, তিনি দেখেছেন তাঁর দিদির সুন্দর চুলে ভরা মাথাটির সিঁথির দুদিকে দুটি চুল সাদা, অর্থাৎ পাকা চুল। দেখতে কিন্তু খারাপ লাগে না। চুল দুটির ইঙ্গিত রূপোলি মধ্যাহ্ন থেকে গৈরিক গোধূলির দিকে প্রসারিত। কিন্তু সমস্ত মাথা জুড়ে যে বিস্তীর্ণ কেশপাশ তা যেন নীল নয়না কোন প্রাণোচ্ছলা যুবতী, উদ্বেল যৌবন তার চারিদিকে নিজেকে ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছে, তার বর্ণ যেন দাঁড়কাকের কৃষ্ণবর্ণকেও হার মানিয়ে দেয়।

গভীর আলিঙ্গনের মদির শিশির বিন্দু দিয়ে সিঞ্চিত করেন। আমি বড় আশা করেছিলাম রে বোন! গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে হেনরিয়েতার। আমি তোকে কী করে বুঝিয়ে বলি জুলি যে, এই মানুষটা যতদিন যাচ্ছে তত যেন নিজের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল এবং সেইজন্যই তাঁর জীবনে আমাকে আর প্রয়োজন বলে মনে করেন না। আমার অশ্রু, আমার ভালবাসা, আমার সমস্ত 'আমি' কে তাঁকে দিতে আমি কোনদিন কার্পণ্য করিনি, আজ সমস্তই তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয়।

জুলি বললেন,—তুই ভারী ছেলে মানুষ যে দিদি। তুই কী জানিস না, আমাদের এ জীবনের সবটাই এ রকম। তুই কাঁদিস না দিদি, তোর কান্না দেখে আমার বুকটাও ভারী হয়ে উঠেছে।

—নারে জুলি, তুই বুঝবি না। এ চিন্তা তো কখনও আমার মনে আসেনি। আজই আমার মনে হচ্ছে যে, যে পৃথিবী আমার স্বপ্নের সন্তান ছিল, আমি হৃদয়ভরে যে পৃথিবীকে ভালবাসতে চেয়েছি, সেই পৃথিবী একদিন লুক্রিন হ্রদের পাশে একটি চন্দ্রালোকিত রাতের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

সুইজারল্যাণ্ড বেড়ানোর সময় আমি এবং আমার স্বামী একদিন ভোর বেলায় পাহাড়ের পথ ধরে নীচে নামছিলাম। ওঁর স্বাভাবিক মৌন নির্লিপ্ততা আমার সকালের সব আনন্দ আবেগকে দমিয়ে দিয়েছিল। আমাদের পাশ দিয়ে কয়েকটি অশ্বারোহী তীব্র বেগে তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ দূর থেকে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে কুয়াশা মেখে কী অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করেছে। তার কিছু দূরে একটা বন, কোন জায়গায় বা উপত্যকা, কোন জায়গায় বা সুন্দর একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে, আবার একটা গ্রামে শান্ত জীবন বেয়ে চলেছে—সমস্তটা মিলিয়ে কী স্বর্গীয় দৃশ্য। আমি আনন্দে মেতে উঠলাম। ওঁকে বললাম—কী সুন্দর দৃশ্য প্রিয়তম, তুমি দেখ। সে একটু হাসলে; কী রকম হাসি জানিস, ঠিক যেন রুদ্রতপ্ত বৈশাখে সূর্য তার ম্লান্ত হাসির রোদ ছড়াচ্ছে পৃথিবীর গালে। সে বললে, 'তোমায় কেন ভালবাসি জানো, তুমি একটা শুকনো জলাশয়ের মত।

—ওর কথাগুলো আমার অন্তরকে বধির করে দিল। আমার মনে হয় কী জানিস যখন আমার মত কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসে তখন ঐ লোকটি হাজার ভাল মানুষ হলেও অমনি করে নারীটিকে বলতে পারে—'তুমি হলে একটা বিশুষ্ক জলভূমির মত।

এরকম এক সন্ধ্যায় তখন আমরা চারদিন ফ্লুলেস হোটেলে ছিলাম। রবার্টের খুব মাথা যন্ত্রণা শুরু হল - ও তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। একাই বেরিয়ে পড়িলাম হ্রদের চারপাশে একটু ঘুরে আসার জন্য।

—সে রাতটা যেন কোন লেখকের গল্পের একটি ছেঁড়া পৃষ্ঠার মত পড়েছিল সেই লুক্রিন হ্রদের ধারে। পূর্ণিমায় আকাশ হয়ে উঠেছিল আলোময়। উঁচু পাহাড়ের মাথাটিতে শুভ্র তুষার পড়ে যেন পাহাড়টিকে মুকুটপরা কোন রাজার মত দেখাচ্ছিল। সেই সঙ্গে হ্রদের জলের নির্জন সুর কলতান সমস্ত রাতটিকে মধুর করে তুলেছিল। বাতাসের ভেতর ছিল একটা

সেই রাত্রির অন্ধকারকে ভেঙে দিল। তারপর জুলি অত্যন্ত ব্যথিতভাবে বললেন—কিন্তু দিদি আমার, সেদিন তুমি ভালবেসে ছিলে ঠিকই কিন্তু কোন মানুষকে নয়, তোমার প্রকৃত ভালবাসাকে তুমি আপন করে, তোমার মত করে চিনেছিলে চন্দ্রালোকিত রাতে।

(গী দ্য মোপাসাঁর "Moonlight" গল্প অবলম্বনে)

"মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতে হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়া থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেইকি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই!"

(রবীন্দ্রনাথ)

দু'জন পুরুষ এবং চালক। দু'এক মিনিট যেতে না যেতেই আমার বুলি ফুটতে আরম্ভ করলো। আমি চুপ করে বসে থাকতে পারছিলাম না। হঠাৎ চালককে প্রশ্ন করে উঠি—আচ্ছা দাদা, আপনি এই লাইনে কতো বছর গাড়ি চালাচ্ছেন? চালক তখন আমার প্রশ্ন শুনে বল্লেন "তা বাবু পঁচিশ ত্রিশ বছর তো হবেনে। সে কি আর আজগের কথা বাবু, আমার মনি হয় তখনও আপনাদের জন্মই হয়নি।" কথাগুলো বেশ টেনে টেনে সুরের মতো করে গ্রামের ভাষায় বলেন সেই ভ্যানচালক। চালকের কথাগুলো সবই সত্যি। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো লোকটাকে। আবার জিজ্ঞাসা করি তাঁকে "আপনি কি শুধু এই ভ্যানই চালান, না অন্য কোন কাজ করেন?

-- না বাবু অন্য কোন কাজ করিনে, তবে নিজের বিঘে খানেক জমিজমা আছে তাতি চাষবাস করি। যা হয় তাতি ষান্‌ছরির খোরাক হয়ে যায়। আর বাকি দিনগুলো ইদিক উদিক ক্যারে চালাই"—বেশ পরিষ্কার ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় সেই ভ্যানচালক।

—"আপনার বাড়ী কোথায়?" —আবার প্রশ্ন করি। —আমার বাড়ি; আপনি ঠিক সময়ে কথা জিজ্ঞেস্ কারেছেন। ওই দেখেন বাবু, ওই ঐ যে গাছের ফাঁক দিয়ে বাড়ী দেখা যায়, ওই বাড়ীটাই আমার—উত্তর দেয় ভ্যানচালক।

প্রশ্নের প্রশ্ন করে চলি আমি। আবার তাঁর দিকে প্রশ্নের বাণ ছুঁড়ে বসে থাকি—আপনার কে কে ওখেনে আছে?

—"তা কি বল্‌বানে বাবু, একড়া মেয়ে তা তারে গত সনে সাদি দে দিছি। আর এখন ঐ বুড়ি আর আমি মা সংসারে।"

"আপনার বুঝি কোন ছেলে নেই"? আবার প্রশ্ন করি।

—"না বাবু, ছেলে পিলে আমার হয়নি। এই একা খাটি যা পাই তাতি দু'জনার বেশ ভালো ক্যারে চলি যায়। আর তারপর কি জানেন বাবু আল্লা-তালাদ যেমনটি রাখবেন ঠিক তাকে তেমনটি হতে হবেনে তার একটুখানি নড়তে হবেনে না"— গ্রাম্য সুরে ধীরে ধীরে বলে চলেন সেই ভ্যানচালক। আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—'আচ্ছা আপনি সারাদিনে কতো রোজগার করেন? —পনেরো বিশ টাকা নিশ্চয়ই!"

—না বাবু অতো রোজগার আমাদের কোনদিনও হয় না; বড় জোর আট টাকা নয় টাকা মাত্তর। এর বেশী না। তারপর রোজ গাড়ী ভাড়া আবার আড়াই টাকা ক্যারে দিতে হয়।

সেই ভ্যানচালকের কথা শেষ হতে না হতেই আবার তাঁকে বেস জোরের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা কল্লাম—আপনাকে য আমি এমনভাবে জিজ্ঞাসা কচ্ছি তাতে আপনি রাগ কচ্ছেন না তো? —না-না রাগ করবো কেন? কতো শতো লোকে অমন তরো কতো কি জিজ্ঞেস্ করতিছেন আর আপনি তো বাবু এই দু'একটা কথা বল্লেন"—বেশ এক ছিলিম মুচকি হেসে নিয়ে উত্তর দেন সেই ভ্যানচালক।

—আচ্ছা আপনার নাম কি?

আছেন ? —"ওখেনে বাবু, "পেঁচো-মাচী" ঠাকুর। ওই যে সব মেয়েদের বাচ্চা হয়ে হয়ে ম্যরে যায়, তারাই ওখেনে যায়। ঠাকুরকে বলে, কাজ হলি পুজো দিয়ে আসে। খুব জাগ্‌গত ঠাকুর বাবু। তবে ওখেনে সব মেয়েদের ব্যাপার।"

শুনে আমার ভীষণ ইচ্ছে হলো ঐ ঠাকুর দেখবার। জায়গা দেখে বুঝতে পাল্লাম নামার আর বেশী দেরী নেই। ইতিমধ্যে আমি পয়সা বের করে তাঁর হাতে দিয়েছি। তিনি আমাকে বল্লেন – 'আপনি পাঁচ পয়সা পাবেন।"

আমি তাঁকে বারণ করে বল্লাম – 'থাক্‌ থাক্‌, আর ওই পাঁচ পয়সা আমাকে দিতে হবে না।

চারদিকে আম গাছের বাগান, আর তাতে ধরেছে অফুরন্ত মুকুল। মুহূর্তের মধ্যে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম সেই সব দৃশ্য দেখে। এমন কোন গাছ নেই, যে গাছে মুকুল হয় নি। প্রত্যেকটা গাছ যেন মুকুলের ভারে নত হয়ে পড়তে চাইছে; মুকুলের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কতো নাম না জানা ফুল রাস্তার চারদিকে ফুটে রয়েছে; কতো কলার কাঁদি রাস্তার ধারে ধারে বাড়িতে বাড়িতে ঝুলছে তার ইয়ত্তা নেই।

আস্তে আস্তে এসেগেলো সেই নির্দিষ্ট জায়গা খোড়গাছির মোড় – কালীতলা। নামলাম। নাবতেই ভাইপো অসিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তারপর বাড়ির দিকে পা-বাড়ালাম। তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। একটু বসে স্নান করে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম করে পড়ন্ত দুপুরে বাড়ির দিকে পা-বাড়ালাম। তবে আসার সময়েও সেই ইস্‌মাইল-চাচাকে দেখলাম ভ্যানরিক্সা নিয়ে উজান আসতে।

ইস্‌মাইল চাচার ভ্যানরিকশো চলে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত বসন্তের শাদা কালো সুখ দুঃখের দাগের ওপর দিয়ে ইস্‌মাইল চাচার ভ্যান রিক্‌শা চলে। দুঃখিনী মেয়ে পুত্রহারা না ভূমিহারা চাষী ভাঙ্গা দেবালয়ের সিঁড়িতে মাথা কুটে কুটে কী এক দুরন্ত জিজ্ঞাসা আর ক্ষোভ নিয়ে যখন নাবাল মাঠের রাস্তায় নামে খালি পায়ে তখন সেই ধুলোর দাগের ওপর দিয়ে সমানে সওয়ারী নিয়ে ভ্যান রিকশো চলে ইস্‌মাইল চাচার। অচেনা এক সওয়ারী নিয়ে ঘোরে, খোঁজে তার বাড়ীর ঠিকানা।

আগুন রাঙা অকাল ঝরা ফুল ঃ সুকান্ত

দেবাশিস দাশগুপ্ত
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ-কলা বিভাগ

উনিশ শতকের প্রথম দশক—সাম্যবাদের কেতন পৃথিবীর বুকে উড়ল। তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল সাম্যবাদের নতুন জোয়ার। বিশ্বের অগণিত শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণী এই নতুন ভাবাদর্শের সংস্পর্শে নিজেদেরকে নতুন ভাবে মূল্যায়নের শপথ নিল। সাম্যবাদের এই আদর্শের স্পর্শে অবহেলিত ও নিষ্পেষিত শ্রমিকরা নিজেদের গুরুত্বের নিরীখে বুঝতে পারল যে মজদুরক্ষেত্র শুধুমাত্র শোষণের জন্য নয়। প্রয়োজনে এই শ্রেণীও একটি স্বতন্ত্র সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের অধিকারকে কায়েম করতে পারে। পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী দেশ থেকে যাতে এই নীতি বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, এর চেষ্টা যদিও তদানীন্তন কয়েকটি শ্রেণী বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিল, তবুও তাদের সেই চেষ্টার ব্যর্থতায় এই নতুন আদর্শের বীজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্যবাদের এই নতুন ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌছোয় বিশ শতকে। এবং এই নীতিকে সফল করার উদ্দেশ্যে ঐ শতকেই ভারতে প্রথম সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সব শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে এই নীতির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হল একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকা। সেই পত্রিকার কিশোর বিভাগের দায়িত্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলেন আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের নায়ক তরুণ কবি শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্য। এই মহান প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়েন এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবুও আমি কয়েকটি বিশেষ দিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

বাংলা সাহিত্যের নব রূপকার ও স্রষ্টা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও পরবর্ত্তীকালে তরুণ কবিদের রচনা পড়ে আক্ষেপ করতে শোনা গেছে।

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সেই কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

যার জন্য বিশ্বকবি কান পেতে ছিলেন, সেই মটির কাছাকাছি কবিই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালের তরুণ কবি সুকান্ত। মাটির বুক থেকেই সে উঠে এসেছিল।

সুকান্ত একটি জ্বলন্ত প্রতিভা। তিনি যেন নতুন যুগের সার্থক কবি। তেত্রিশের শ্রাবণে জন্মে মাত্র একুশ বৎসরের মধ্যে তিনি নিজস্ব প্রতিভাবলে স্থান করে নিয়েছেন অগ্রগন্য কবিদের মাঝখানে। এত অল্প বয়সে পাঠ্যাবস্থায় তিনি যে কিভাবে এত দেশ জোড়া খ্যাতির অধিকারী

সুকান্ত স্বতন্ত্র। নবান্নের কমলে তাঁর মনে পড়েছে কৃষক মজুরদের কথা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রচণ্ড পরিশ্রমের করে ভরিয়ে তোলে সবুজ শ্যামল প্রান্তর। কিন্তু এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিণামে এরা কি পেয়েছে? পেয়েছে কি দুবেলা দুমুঠো পেটভরে অন্ন? তাদের উৎপন্ন কমলই তাদের ভৎর্সনা করে চলে গেছে অন্যত্র। তাদের কণ্ঠস্বরের স্বার্থে কণ্ঠ মিলিয়ে কবিও প্রশ্ন করেছেন—

"এই নবান্নের প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?"

সাম্যবাদী রাশিয়ার নেতা লেনিনকে তিনি কেবল রাশিয়ার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে চান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন বিপ্লবের অন্য নাম লেনিন। তাই তিনি চেয়ে ছিলেন প্রত্যেক দেশের প্রতিটি মানবের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুন। তিনি আবার উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠেছেন—

"... লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই দমন,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।"

জাতীয় পরাধীনতার গ্লানি এই তরুণ কবিকে আঘাত করেছিল। তাই স্বাধীনতাযুদ্ধে চট্টগ্রামের বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—

" ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম
চট্টগ্রাম বীর চট্টগ্রাম"।

ছন্দের লালিত্য ঝংকার তাঁর কাছে কষ্ট বলে মনে হয়েছে। তিনি বিদ্রোহ করেছেন প্রচলিত কাব্যজগতের বিরুদ্ধে। ক্ষুধার্ত মানুষের কান্নায় তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই বুভুক্ষু পৃথিবীতে এখন কাব্য করার অবকাশ নেই। তিনি প্রথাসিদ্ধ ছন্দের লালিত্যের পরিবর্তে গাদ্যিক রূঢ়তাকেই বরণ করে নিয়েছেন। কবিতার স্নিগ্ধতা, পদ, লালিত্যকে তিনি মুছে ফেলতে চেয়েছেন। তাই পূর্ণিমার চাঁদ সুকান্তের চোখে এক টুকুরো ঝলসানো রুটি।

" —কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

রবীন্দ্রযুগে বা রবীন্দ্র পরবর্তীযুগে প্রায় প্রত্যেক কবিই রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত। কিন্তু একমাত্র সুকান্ত, যিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন নি।

কিন্তু এই নবীন প্রতিভার কণ্ঠস্বর অকালেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি মাত্র একুশ বৎসর বয়সে বিদায় নিলেন বাংলা সাহিত্যঅংগন থেকে।

নানা দাঙ্গা হাঙ্গামা বিষবাষ্পে পরিণত তখনকার সমাজের যে জঙ্গলাকীর্ণ পথ অপসারণ করে তিনি এগিয়েছিলেন, তা তাঁর অকাল মৃত্যুতে স্তব্ধ করে গেছে। ফলে যে সংকটপূর্ণ পথকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন, তা যেন ক্রমেই পূর্বাবস্থায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। তাই আমরা বেদনাবুকে

SONNET

Prof. **Ajit Krishna Basu**

[Composed as an experiment on my 21st birthday in July 1932]

Open, my soul, thy long continued veil
Awake ! Thy Sun is rising, forsake thy slumber
The golden vessel of thy heaven has set its sail.
Oh, hast thou not seen, times without number
When the sleeping bud opens its eyes in the morn,
She looks up straight towards the rising sun'
And when at dark she is left alone, forlorn
Her face grows pale, as if her life is done ?
She no more adorns, as once she did, the bower.
But fades away like a violin's vanishing din,
So let thy petals, O, my soul, my flower,
Open now, when the sun of Life is seen,
For if thou letst slip this opportune hour
The light may fade and the dusk begin.

গৌরচন্দ্রিকা

ডাঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কালোত্তীর্ণ যুগ পুরুষ। বুদ্ধ, যিশু হজরত এঁদের মূর্তিও কালতরঙ্গকে অতিক্রম করে বর্তমান মানব সমাজে এসে পৌঁচেছে। কাল যেমন নিরবধি বিচার বিশ্লেষণ মূল্যায়নের শেষ ও তেমনি নেই। আমাদের নদের নিমাই শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়েও ঐতিহাসিক সমালোচক তত্ত্বদর্শী জ্ঞান বৃদ্ধগণ পক্ষ বিপক্ষ মতের আন্দোলনের অবশেষ রাখেন নি। এই নিরসন থেকেই নির্যাস বেরিয়ে আসে। তখন তা দিয়ে মানুষের ধর্ম শিল্প সংস্কৃতি সুরভিত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেবকে যাঁরা ইতিহাস কি সমাজবাদী দৃষ্টিতে নিউরটিক পাগল অপ্রকৃতিস্থ বলে প্রচার করেছেন তাঁরাও যেমন ভ্রান্ত বা দ্বেষক একদেশদর্শী তেমনই যাঁরা নর্তন ভুলণ্ঠন ভোগ বিলাসের বন্যায় প্লাবিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমূর্তিকে ঘোলাটে করেছেন, তাঁদেরও আমি সম্মান করি না। ভুবনেশ্বর মিত্র নামক এক দিকপাল পণ্ডিত প্রায় একশত বৎসর আগে গৌরাঙ্গলীলারহস্য নামক এক বৃহৎ গ্রন্থে চৈতন্যভূর্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ছেড়েছেন, আর এই একশো বছর পর মায়াপুরে ঘটল তাঁর দ্বিতীয় সমাধি। ভালই হল। দৃঢ়তর হল আমার কাছে কবির ধ্যানের ধন বাংলার ঘরছাড়া এক তরুন যুবা পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ। যাঁর সমস্ত জীবন্ত বিগ্রহটি বিধৃত বাঙ্গালীর প্রাণের সুধা মন্থন করা কাব্য মাধুর্যে শ্রীচৈতন্য দেবকে নিয়ে যত কবিতা লেখা হয়েছে যত গান জীবন কথা চরিতকথা যাত্রা পালা ইত্যাদি বাঁধা হয়েছে সে তুলনায় বিবেকানন্দ কি সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে ততটা হয়নি। বিশেষত কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টিপথে এঁদের কর্মমুখর জীবন শিল্পিত হয়ে ওঠেনি। আমি চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর সাংবাদিক রচনাগুলিকে বাদ দিচ্ছি। মহাত্মা শিশির কুমার এবং অচিন্ত্য কুমার শ্রীচৈতন্যদেব এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনকে সাহিত্য রসান্বিত করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমরস শ্রীগৌরাঙ্গের বাস্তব জীবনের মধ্যে জমাট বেঁধেছিল। গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে সে পরিচয় স্পষ্ট। আমি কীর্তনিয়ার মুখে মাথুরের গৌরচন্দ্রিকায় শচীবিরহের সুর মূর্চ্ছনায় ব্যথাহত হয়েছি। এটি এত মানবিক! বৈষ্ণবপদ গাইবার আগে রোমান্টিক কল্পলোকের হাওয়া গাড়ী বা পুষ্পক রথ ছাড়বার আগে এই যে মাটি ছুঁয়ে কপালে ঠেকানো। খোল করতালের ত্রিমি ত্রিমি ঝিঁ ঝিঁ ঝিলিক তুলে আগে একটি ঘরের মানুষকে চিনিয়ে

হরি চাহয়ে রক্তের পারা রাংতার মত জ্বলজলে চাহনি। কাজীর অপশাসন। ছাগরক্ত গায়ে মাখিয়ে ধর্মত্যাগী মুসলমান যবন হরিদাসের ওপর চলেছে বেত্রাঘাত। ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক ধনাঢ্য জমিদার সবাই লাগল সমাজদ্রোহীকে শায়েস্তা কর। জন সমুদ্র উত্তাল, গৌরাঙ্গ কীর্তনরোল তুলেছেন মিছিল সমাবেশে। প্রেম সংগ্রামী মানুষটির শ্রান্তি স্বেদ আর্তি জমাট বেঁধে আছে গৌরচন্দ্রিকার কবিতায়। পারল না। হেরে যাচ্ছে দেশাচার, ওদিকে ঘরের আঙিনায় শুকিয়ে মরছে শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া। গোবিন্দ ঘোষ আর্তনাদ করে বলে ওঠেন, 'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও বাহু পসারিয়া গোরা চান্দেরে ফিরাও'। শচীমায়ের কোল ফেলে গেল বিশ্বরূপ গেল গৌরাঙ্গ। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? পাগলিনী ভিজা বস্ত্র চুলে ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে। স্নান করতে গিয়ে তার নাকের বেশরটি খুলে পড়েছে জলে। থেকে থেকে কাঁপছে ডান হাত, অমঙ্গলের ইশারা। আতঙ্কিত নববধু ভাবেন ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর। গৌরচন্দ্রিকায় নিমাই সন্ন্যাসদের বিরহের এক প্রান্তে মিশ্র পরিবার অপর প্রান্তে সমস্ত নবদ্বীপ জম্বুদ্বীপ ত্রিভুবন। যার জন্মে শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায় তিনি চলে যেতেও যে আকুল ঢেউ। শ্রীক্ষেত্র পুরীনীলাচল থেকে শচী মাতাকে দেখতে এসেছেন জগদানন্দ রায়, কৃষ্ণহারা গোকুলের মত গৌর হারা নবদ্বীপ। 'অকালে খসিছে পাতা'। শচীমা শ্রীবাস পত্নী সই মালিনীর ক'ছে স্বপ্ন সংবাদ দিচ্ছেন আঙিনায় দাঁড়িয়ে নিমাই যেন তাঁকে মা বলে ডেকে উঠল, কাছে এসে পায়ের ধূলা নিয়ে বলছে, 'তোমার প্রেমের বলে ফিরি আমি দেশে দেশে রহিতে নারিলাম নীলাচল', এই মাতৃস্নেহ ব্যাকুল দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ গলায় গুঞ্জার মালা হাঁটু ছোঁয়া দুই হাত তুলে অভয় কীর্তন রত হাসি মুখ গৌর নিতাইকে বাঙালী সন্ন্যাসের কাঙ্গাল বেশ পরিয়ে আর ফেরায়নি। ঘরে ঘরে আসন দিয়েছে চারশো বছর ধরে, এই রূপ থেকেই সে উৎসারিত তাবৎ বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের "এই লভিনু সঙ্গে তব সুন্দর হে সুন্দর"— শরৎবাবুর কমললতা তারা শঙ্করের রাই কমল রসকলি আর বিভূতি মুখুজ্জের ননীচোরা গল্প যেন এই চির সুন্দর যুগলমূর্তি গৌর নিতাইয়ের সামনে হাত জড়ো করে বসে লেখা।

এহেন কোটি কোটি নরনারীবন্দিত এক পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পিতৃত্ব ইত্যাদির তাকত যাচাই করবার প্রয়াস অবঙ্গীয় ফ্রয়েড পড়া কলেজী মাষ্টারি ছাড়া আর কি? আর এই আত্মপ্রক্ষেপনের বিকারের দিনে আজ পূণ্য দোলযাত্রায় আমি অতীতে ফিরে চেয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি:

এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপ। জগন্নাথ মিশ্রের একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। শচীর কোল জুড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ "চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়"। "অনন্ত অর্ব্বুদ" মানে দলে দলে অসংখ্য লোক চলেছে গঙ্গায় সবার মুখে হাসি সবাই বড় খুশি, কেন? দুদিনের মানুষ বেশে এসেছে তার প্রাণের ঠাকুর 'আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস'।

শিক্ষা সমীক্ষা

অধ্যাপক অজয় কুমার সেন

শিক্ষামূলক যে কোন আলোচনার প্রারম্ভেই সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি ভিড় করিয়া আসে। এই সমস্ত পটভূমিকা ব্যতীত যে কোন শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা যে দুঃসাধ্য তাহা বলিলে প্রায় অত্যুক্তি কিছু হইবে না।

শিক্ষা-নীতি : আজ সারা দেশ জুড়িয়া শিক্ষা-সংক্রান্ত কত যে আলোচনা সমালোচনা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষানীতি নির্ধারণে শিক্ষকদের অভিমতই সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত, নীতিগতভাবে একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কিন্তু কার্য্যত দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র শিক্ষক সমাজই উক্ত শিক্ষানীতি নির্ধারণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজের অভিমতকে গৌণ করিয়া প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাই শিক্ষানীতি নির্ধারনের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলেন। এইস্থলে আমলাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইল, যেখানে শিক্ষক-সমাজের ভূমিকাটুকুও যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাইল না। তবে হ্যাঁ, শিক্ষকসমাজ যে কোনও রূপ শিক্ষা-বিষয়ক সম্মেলনে আহূত হন নাই, এ কথা বলিলে ভুল হইবে, তাঁহারা কেবল একটিমাত্র শিক্ষা-সংক্রান্ত সম্মেলনে উদার আহ্বান পাইয়াছিলেন, যে সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল—'কি করিয়া গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যাকর করা যাইবে'।

এ বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। বর্তমান একটি অতি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। যখন সরকার '১০+২+৩' শিক্ষা কাঠামোটি প্রবর্ত্তন করিতে যাইতেছিলেন, তখন কি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনগুলির অভিমত কি, তাহার উদার আহ্বান জানাইয়াছিলেন? যাহার ফলে আজ এই শিক্ষা-কাঠামো সম্পর্কিত যে বিবিধ জটীলতা ও বিভ্রান্তি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার কারণ কি এই নহে যে—এ বস্তুকে যাঁহারা বাস্তবরূপে রূপায়িত করিবেন, ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে তাঁহাদের অভিমত গ্রহণের কোনও রূপ পরিকল্পনাই ছিল না পূর্বাহ্নে?

বর্তমানে সারা দেশে যে কোন প্রতিষ্ঠানে এক বিশিষ্ট জিনিষ ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ লইতেছে, তাহা হইল রাজনীতি। যাহার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কার্য্যই সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে না, এমন কি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও ইহার প্রভাবমুক্ত নহে। তাই প্রকৃত শিক্ষার্জন নিমিত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতি অবশ্যই রাজনীতির ঊর্দ্ধে রাখিতে হইবে। কারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে

আন্তরিকতা প্রভৃতি বিশিষ্ট গুনগুলি থাকা বিধেয়। ইহা ছাড়া পাঠানুশীলন কারীদের অবগত হওয়া উচিত যে—তাহারা তাহাদিগের পাঠানুশীলনের নিমিত্ত শিক্ষায়তনে যে মাহিনা দিয়া থাকে, তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিবিধ ব্যয়ের তুলনায় কিঞ্চিৎকর। এই অবশিষ্ট ব্যয়াদি মিটাইতে সরকার কর্তৃক বহু অর্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে, এবং সরকার উহা জনসাধারনের নিকট হইতে নেওয়া কর হইতেই দিয়া থাকেন। তাই প্রতি ছাত্রের মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যেখানে তাহারা জনসাধারনের দেওয়া "কর" দিয়া শিক্ষার্জন করিতেছে, সেখানে সমাজের কল্যানহেতু তাহাদিগেরও কিছু করণীয় রহিয়াছে। এই করণীয় তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে থাকাকালীনও করিতে পারে, অন্যদিকে শিক্ষালাভের কার্য শেষ করিয়াও করিতে পারে। যেমন "জাতীয় সেবা প্রকাশ" (N. S S.) এর মাধ্যমে স্কুল, কলেজ প্রভৃতির অধ্যয়নরত ছাত্ররা দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকে; তেমনি শিক্ষা লাভ শেষ করিয়াও বিবিধ মাধ্যমে জনকল্যানে আত্মসমর্পন করিতে পারে।

সব বাধা ত বিরোধী শক্তির সৃষ্টি নয়—সাধারন অশুদ্ধ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, যা সকলের মধ্যেই আছে।

—শ্রীঅরবিন্দ

খেলা ধুলা মুষ্টিযুদ্ধ নৌ চালনা প্রভৃতি বিভাগের সুপরিচালনার ভার নিয়েছেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুনীল সিদ্ধান্ত মহাশয় এবং অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

১৯৭৫-৭৬এর পূর্বাঞ্চলীয় অপেশাদার বাইচ্ প্রতিযোগিতা সংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত বেয়ার্ড কাপ বিজয়ী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (বিভাগ স্নাতক '৭৫-৭৬) আমাদের কলেজের গর্ব। ইন্টার কলেজিয়েট নক্ আউট রিগেট্টা বিজয়ী হয় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত একটানা।

বিজয়ী দলে ছিলেন সর্বশ্রী সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, রমিত মুখার্জী, শংকর বৈদ্য ও পার্থ ভাদুড়ী।

বর্তমানে কলেজের পরিচালন ভার নিয়েছেন এ্যাডহক কমিটি। পূর্বের ম্যানেজিং কমিটি আর নেই। এখন কলেজের লেখাপড়া ও নিয়মানুবর্তিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই বিশাল বিদ্যাভবনটির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বর্তমান পরিচালকরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থাগার-গুলিতে প্রচুর বই কেনা হয়েছে। নব নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে কলেজের ঐতিহ্যকে অম্লান রাখবার চেষ্টা করছেন। তবু আমরা কতকগুলি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলেজের প্রতিটি ক্লাসঘর এখনও লেখাপড়ার অনুকূল নয়। জানলার কাঁচগুলি ভাঙ্গা অথবা নেই। ফলে বাস্তার প্রচণ্ড গোলমাল, অধ্যাপকদের বক্তৃতার বিঘ্ন। ছেলেদের অস্বস্তির কারণ ঘটায় ১৪নং ঘরগুলিতে অনার্স ক্লাশ চালানো মুশকিল। আলো পাখার অভাব কলেজ ভবনের দেওয়ালগুলি পোষ্টার মুক্ত হোক।

১৯৭৭-এর ২৫শে বৈশাখের রবীন্দ্র জয়ন্তীর স্মারক অনুষ্ঠানে ছাত্র অধ্যাপকরা মিলেছিলেন কলেজ কক্ষে, অধ্যক্ষ শ্রীদুলাল মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও ছাত্র অধ্যাপকদের অংশ গ্রহনে অনুষ্ঠানটি অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিলেন ১ম বর্ষের ছাত্র বিপ্লবে রায় চৌধুরী। অধ্যক্ষ মহাশয় খানিকক্ষণ বাদে অন্য কাজে চলে যান অধ্যাপক সুধীর ব্যানার্জিকে চেয়ার দিয়ে। গান ও আবৃত্তিতে অংশ নেন—শুভঙ্কর সেনগুপ্ত ২য় বর্ষ বিজ্ঞান (সফল করো হে আমি হেথা থাকি)।

প্রদীপ নাহা ২য় বর্ষ কলা (তুমি কেমন করে গান করো, তব প্রেম সুধারসে)
অশোক মিত্র ১ম বর্ষ কলা (আফ্রিকা)
অরুণ বসু ১ম বর্ষ ইং অনার্স (বিলম্বিত)
দেবাশিস মজুমদার ৩য় বর্ষ অনার্স বাংলা (ছিন্ন পত্র থেকে পাঠ)
বিশ্বজিৎ সরকার ১ম বর্ষ বিজ্ঞান (নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ)

সংস্কৃতি জাতির প্রাণ শক্তির উৎস। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরীক্ষা, ক্লাসের রোজনামচা ইত্যাদির বাইরে শিক্ষক ছাত্রদের জ্ঞান বুদ্ধি ও সৌন্দর্য চর্চার একটা উন্মুক্ত অবকাশ থাকা চাই। দুঃখের বিষয়, আমাদের ঔদাসীন্য মানসিক জড়ত্বের জন্য এ কলেজে 'রবীন্দ্র পাঠচক্র' নামে যে সাংস্কৃতিক উদ্যোগটি ছিল, যার পরিচালক ছিলেন ভূতপূর্ব বঙ্গসাহিত্য বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ও

চয়ন

১

"ধেয়ানের দ্বার প্রান্তে প্রতীক্ষিয়া আছি সারারাত,,
সাধনার সুরে তাঁরে আনমনে ডাকি নাম ধরি,
গুনি দন্ত পল, তাই কবে তাঁর মিলিবে সাক্ষাৎ
কবে সারা কুঞ্জ সম, কুসুমে কুসুমে যাবে ভরি।
এসো তুমি ব্যক্ত হোক জীবনের সত্য পরিচয়,
প্রেম চাই, আগে তাই এসো তুমি প্রেমের হৃদয়"।

(স্বর্গীয় অধ্যাপক অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়
: সাধুতার গান : কলেজ পত্রিকা ১৩৬১)

২

তোমার কান্না শুনেছি তাই :
নবগঙ্গার জলে ঢেউ তুলে
বুড়িগঙ্গা কি বুড়িবালামের
প্রমত্ত তুফান থেকে
এ বুকে কল্লোল তুলে নিয়েছি
বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে
বঙ্গোপসাগর তোল পাড় করেছি
তোমার কান্না শুনেছি তাই।
তোমার কান্না শুনেছি তাই
হাজার বার
চট্টগ্রাম থেকে খিদিরপুরের
জেটিতে ঘুরে বেড়িয়েছি ;
ভাঙ্গা মাস্তুলের আর্তনাদে
বিনিদ্র রাত্রির ছায়ায় হেঁটেছি
দুর্ভিক্ষে বিদীর্ণ ধূ ধূ মাঠের
সীমানা মাড়িয়েছি

প্রতিবেদনে—

ছোট ভাইদের অনুরোধ তোমাকে এ বছর আমাদের ছাত্র সংসদে আসতেই হবে। হ'ল তাই-ই অর্থাৎ আমাকে Unionএ থাকতে হ'ল আসতে হ'ল কার্যাকরী সভাপতি হিসাবে।

সত্যি বলতে কি কলেজের সমস্যা অনেকটাই বিগত ছাত্র সংসদ মিটিয়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু এত বড় কলেজে সমস্যারও শেষ নেই—তাই আমাকে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দিতে হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে যা ছাত্রমনে 'অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিলো।

লাইব্রেরীর বই বৃদ্ধি, ও সেমিনারে আরও পর্যাপ্ত পরিমাণ বই আনবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে বার বার চাপ দিয়েছি। কাজও কিছু হয়েছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎ সামন্য। ছাত্রদের দাবী অনেক বেশী, আমাদেরও তাই Botany Honsএর ব্যাপারে অনেকটা অগ্রসর হলেও স্থান সংকুলানের জন্য তা খোলা সম্ভব হ'ল না, তাছাড়া ল্যাবরেটরীর সমস্যা তো রয়েছে-ই,।

ছাত্র সংসদের অনেক দাবী আজও মেটেনি। ছাত্র সংসদ অনেক বিষয়ে দাবী জানালেও সাধারণ ছাত্ররা ছাত্র সংসদকে সময় মতো 'সমস্যা' মোকাবিলার কাজে ব্যবহার না করার জন্য সমস্যা কিছু রয়েই গেল, আমার আশা আগামী দিনে এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ ছাত্ররা নিজেরা উদ্যোগী হ'য়ে ছাত্র সংসদে যেই থাকুক তাদের চাপ দিয়ে সকলের দাবী আদায় করে নেবে।

পরিশেষে, ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে আমি আমার সকল সহকর্মী ও বন্ধুদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, সকৃতজ্ঞচিত্তে অধ্যক্ষ, উপচার্য ও অধ্যাপক এবং অশিক্ষক কর্মচারী ভাইদের স্মরণ করি যাদের আশীর্বাদে, চেষ্টায়, পথ নির্দেশনায় আমরা চলতে পেরেছি, বলতে পেরেছি দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্রদের কথা।

বিনীত—
সোমনাথ বসু
কার্যাকরী সভাপতি

ইন্টার ন্যাশনাল প্রিন্টার্স
৪৫/বি/৬, নস্কর পাড়া রোড,
(পশ্চিম পুটিয়ারি)
কলিকাতা-৪১।

আশুতোষ কলেজ ৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে অধ্যক্ষ শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইন্টার শ্যাশনাল প্রিন্টার্স, ৪৫/বি/৬ নস্কর পাড়া রোড (পশ্চিম পুটিয়ারী), কলিকাতা-৪১ হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

দেবকুমারবাবুর কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য নিয়ে এখানে বিপ্লবী অকৃতদার স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক পদাতিক প্রাজ্ঞ দৃঢ়চেতা অধ্যাপক সুরেশচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণে প্রবৃত্ত হলাম।

নীরোদবাবু বললেন, সুরেশচন্দ্র ছিলেন 'অকৃতদার সর্বত্যাগী স্বল্পভাষী ধীর স্থির ও দৃঢ়চেতা।"

১৯১৮ ও ১৯২০ সালে প্রবেশিকা ও আই, এস, সি, দুটি পরীক্ষাতেই সুরেশচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী বৃত্তি লাভান্তে ১৯২১-এ গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন।

তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের ও ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী (অভয়াশ্রম। অভয়াশ্রমের প্রথম পর্যায়ের এগারজন সদস্যের অন্যতম হিসাবে সুরেশ চন্দ্রের কারাসঙ্গী ছিলেন শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়।

আট বছর বাদে ১৯২৮ সালে, সুরেশচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্সসহ বি এ, এবং ১৯৩১-এ ইংরেজীতেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে সপ্তম স্থান লাভ করে ব্যস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও দীর্ঘকালীন কারাবরণ বিপর্যয় সত্বেও আশ্চর্য অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করলেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২৮ বছর সুরেশচন্দ্র ছিলেন সম্পূর্ণরূপে দেশসেবাব্রতী। আজীবন তাই ছিলেন অবশ্যই—পথ—কারাগার জন জীবনের উত্তাল আর্ত্তির মধ্যে তিনি যে মহাজীবনের মন্ত্রদীক্ষা নিলেন ষোলো বছর ধরে, তার পুতাগ্নি শিখা অনির্বাণ রাখলেন ছাত্র সমাজের মাঝখানে।

মিত্র ইন্‌ষ্টিট্যুশন, ভবানীপুরে কিছুকাল ইংরেজীর শিক্ষকতা করার পর তিনি যোগ দেন আশুতোষ কলেজে ১৯৪৬ সালে। ১৯৬২ সালে তিনি অবসর নেন। এ বিদ্যায়তনের শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন মিত্র দার্শনিক ও পথভ্রষ্টা। তাঁর সম্পাদনা কর্মেই কলেজ প্রত্রিকার কয়েকটি উজ্জ্বল দিন চিহ্নিত। সুরেশচন্দ্র, অমিয়রতন, সত্যকিঙ্কর প্রভৃতি এই কলেজের প্রয়াত অধ্যাপকবৃন্দ তাঁদের সাহিত্য সংস্কৃতির অমলিন রুচিবোধ দিয়ে যে ঐতিহ্য সংরক্ষিত করেছিলেন জানি না তার যোগ্য উত্তরাধিকার আমরা কতটুকু বহন করতে পারছি। কিন্তু সুরেশ চন্দ্রের মত নিঃস্বার্থ দেশব্রতী ভেদভঙ্গহীন রাজনৈতিক প্রাণ-প্রেরণা নিরলস শিক্ষাদর্শ ও ছাত্র সমাজের প্রতি অকুণ্ঠ দরদ যেন আমাদের চিরকালের পাথেয় হয়, শুধু এই আকাঙ্ক্ষাই আমরা সর্বতোভাবে করতে পারি।

১৩৭৮-এ ২২শে চৈত্র 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত সুরেশচন্দ্রের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নবাবগঞ্জ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে সুরেশচন্দ্র দে লিখেছিলেন :

"অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আওনার বিলের পশ্চিমে
পারে শোলানগর ও চন্দ্রখোলার মাঝখানে নৌকার
উপর দাড়িয়ে প্রত্যাসন্ন আষাঢ়ের মেঘমেদুর অম্বরতলে
নবাবগঞ্জের রম্য প্রকৃতির প্রসারিত পুণ্যচ্ছবির মধ্যে
বাংলা মায়ের ভুবন ভুলান রূপ বুঝি চকিতে প্রত্যক্ষ

গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা স্মরণ করি আমাদের প্রিয় অফিস কর্মী কেশব লাল পালকে। গত ১১.১.৭৭ তারিখে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন চিরকালের মত। তাঁর মৃত্যুতে আশুতোষ কলেজের প্রবেশ পথের প্রথম ঘর ও সেই ঘরের ডান দিকের প্রথম যে আসনটিতে বসে তিনি হাসিমুখে আমাদের 'রিসিভ' করতেন সেটি তাঁর অপূরণীয় ক্ষতির আকস্মিক আঘাতে জর্জরিত হয়ে আমাদের মনকেও আহত করেছে সন্দেহ নেই। কেশববাবু এই কলেজে যোগ দেন ১৪.৭ ৪৯-এ তাঁর কার্যকাল মহাকালের নিষ্ঠুর হনন খণ্ডিত হল। কেশববাবুর বেদনার্ত্ত পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আজ নয় আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ১৪ ৭ ৪৯-এ গন্নু মাহাতো। একটি অতি বিশ্বস্ত শ্রমিক সর্বজন প্রিয় মানুষ। সেও চলে গেল হঠাৎ। ময়দানে আমাদের খেলার তাঁবুতে কতবার আমরা তাকে দেখেছি। খেলোয়াড় ছাত্রদের দর্শকদের সে ছিল নিত্য সঙ্গী। জানি না ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাসে, কোন অপরাধে গন্নু সাতাত্তর এর এগারই জানুয়ারী কালের বুকে মিলিয়ে গেল। এই সরল গ্রামীণ মানুষটির আত্মীয়বর্গের কাছে আমরা শোক সমবেদনা জানিয়েছি। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় কেশববাবু ও গন্নু মাহাতোর আকস্মিক মৃত্যুতে কলেজ শিক্ষকও সর্বস্তরের শ্রমিকদের শোকসভায় এই দু'জন একনিষ্ঠ কর্মীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

জীবনের দিক থেকে এ জীবন স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হলেও এ জীবন কখনও মুছে যায় না। এ জীবনটুকু যেন তাদের কাছে অর্থবহ ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারি এই প্রার্থনা আজ আমরা আন্তরিকভাবে করি আর এই কাজে তাদের সহযোগিতা কামনা করি। তাদের সাফল্য ও খ্যাতির মধ্যেই শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নয়, শিক্ষকেরও অমরত্ব। আমরা এইভাবেই দেশ ও সমাজের কাছে আমাদের ঋণ কিছুটা শোধ করবার চেষ্টা করি। তারা তাদের 'আশুতোষ কলেজ'কে আপনার জন বলে ভালবাসুক, আমরাও তাদের মধ্যে বেঁচে থাকি এই আকাঙ্খাই বোধ হয় আমার জীবনের সন্ধ্যায় ও বিদায়বেলায় স্বাভাবিক।

সব ছাত্রের সঙ্গেই দেখা করেছি, তাদের সব কথা শুনেছি, তার জন্যে হয়ত কলেজের অন্য কাজ কলেজ সময়ের পরে করতে হয়েছে, তবুও শুনেছি তবে সকলের জন্যে সব করতে পারিনি। কোন সময় সমীচীন নয় বলে করতে পারিনি, কোন সময় ক্ষমতায় কুলোয়নি বলে। সেটাও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, বেশী সময়ই তারা বুঝেছে, হয়ত কোন সময় বোঝেনি হয়ত বা আমার নিজের অক্ষমতার জন্যেই বোঝাতে পারিনি। ছাত্রদের অধিকাংশের মধ্যেই সদিচ্ছা দেখেছি আবেদনে সাড়াও পেয়েছি। নিজের বিচারবুদ্ধি মত কর্ত্তব্য করার চেষ্টা করেছি, কতদূর সফল হয়েছি, সমগ্র কলেজের স্বার্থের দিক থেকে, সে বিচারের ভার ছাত্রদের ওপর ও আমার সহকর্ম্মী শিক্ষক ও কর্ম্মচারীদের ওপর ছেড়ে দিতে একটুও দ্বিধা নেই। বিদায়বেলায় আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন বর্ত্তমান এমনকি ভবিষ্যৎ ছাত্রদেরও জানাই আমার আন্তরিক শুভ কামনা।

আমার শিক্ষক ও অশিক্ষক সহকর্ম্মিদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, তাঁরা আমাকে যাচিত, অযাচিত সবই দিয়েছেন—উৎসাহ সহযোগিতা, এমন কি ভালবাসাও। সুখী পরিবারের কর্ত্তা হওয়ার দায়িত্ব তাঁরাও ভাগ করে নিয়েছেন, শুধু সুখে নয় দুঃখেও। আমার সাফল্যের অংশে তাঁরা অংশীদার আমার যা কিছু ব্যর্থতা ছিল, সেটা আমার নিজস্ব। তাঁরা আমাকে সিদ্ধান্তে আসায় সাহায্য করেছেন উপদেশ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, কিন্তু যেহেতু সিদ্ধান্তটা আমারই ছিল, ভুলটা আমারই। তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তার হিসেব নিকেশ একটা অবসর পাওয়া জীবনের খাতায় কুলোন সম্ভব হয়ত নয় যা পাইনি সেটা, আমি নিশ্চিত যে, আমার হয়ত প্রাপ্য ছিল না।

কলেজের ভবিষ্যতের দিকে নূতন সঙ্কল্প নিয়ে অভিযানের সময় বরাবরই ছিল, আজও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অভিযানের জন্যে দরকার একটি সুদৃঢ় মূল ঘাঁটি, যে ঘাঁটি গড়তে হবে সাহস, মনীষা স্বপ্ন ও সামাজিক সচেতনতা দিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রতিষ্ঠানে এটা সম্ভব। এই কলেজের অভিন্ন স্বার্থে সেবায় এমন কি ত্যাগেও ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ম্মচারীদের আগের মতই সমান দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যেই এই ঘাঁটির বনিয়াদ গড়া হতে পারে। দায়িত্ব এলেই নেতৃত্ব পাওয়া যাবে।

কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার আবেদন যে তাঁরা আমাকে এই শক্তি দিন যাতে আসন্ন অবসর নেবার সময় আমি যেন বলতে পারি "Master, my task is done"।

শ্রীনারদ কুমার ভট্টাচার্য

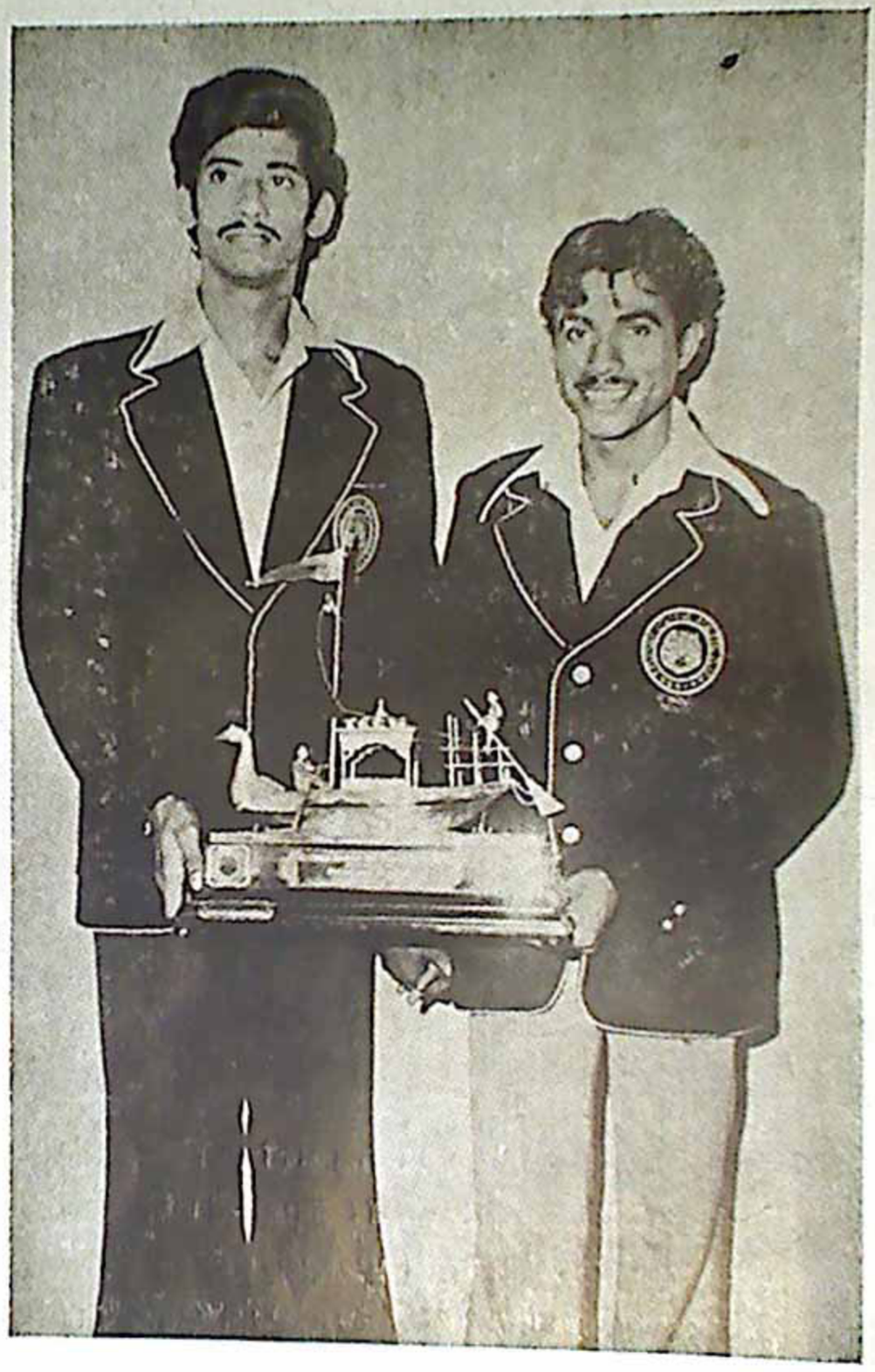

বিজয়ী অধিনায়কবৃন্দ :—

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৭৬-৭৭)

চিররঞ্জন কাঞ্জিলাল (১৯৭৫-৭৬)

ও মনন যেতে চায় হারিয়ে। চোখের ভিতর আঁধির ধুলো ঢুকে পড়ে। তবু পুরোনো কাসুন্দির চর্বিত চর্বণ ছেড়ে নতুন কালের নতুন মন চায় যুগ সচেতন বাস্তব-সাহিত্য। এই কলেজের একাধিক ছাত্র রোদে জলে হেঁটে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে কাগজ বের করে। যখন তারা তা আমাদের হাতে তুলে দেয় তখন বুঝি পরীক্ষার জন্য বন্ধ ক্লাসের দরজার বাইরেও তারা বাংলা ভাষার সেবা করছে। ডিগ্রি দেবার বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এইসব যৌবনদৃপ্ত সাহিত্য শ্রমিকদের সম্ভ্রম ও উৎসাহ দিক। তার পরিবর্তে দেখছি কলেজের স্নাতক শিক্ষাসূচীতে বাংলা ভাষাকে বিকল্প একটি বিষয় হিসাবে কোণ ঠাসা করার তে ড়জোড় করছে। আমরা এই জঘন্য আমলাতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বাংলা ভাষাসাহিত্য পঠন পাঠন পদ্ধতির সংস্কার হোক কিন্তু তাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সংকুচিত করার কোনো যুক্তি দেখি না। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ও এই বিপদের সংকেত লক্ষ্য করা যায়।

বলা বাহুল্য আজও আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা সেকলীয় পুঁথিকেন্দ্রিক একটি অবাস্তব পদ্ধতিতে অনড় হয়ে আছে। আমরা আশা করব বঙ্গভাষা ভাষী মানুষ শিক্ষার একটা উদার প্রগতিশীল আবহাওয়ায় সজীব হয়ে উঠবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করুক। ছাত্ররা চায় যুক্তিনিষ্ঠ নির্মোহ সংকীর্ণ রাজনীতিযুক্ত উন্নত রুচিশীল শৈল্পিক পরিবেশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে জমা হয়েছে এক অনিশ্চয় ভবিষ্যতের গ্লানি। তিরিশ বছর ধরে এই অকেজো শিক্ষা আমাদের কিছুই দিতে পারিনি। তবু যখন দেখি তরুণ লেখকরা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের পাতায় মৌলিক চিন্তা কল্পনা ও বুদ্ধির স্বাক্ষর রাখে তখন তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে সংকোচ হয় "ওরা পড়াশুনা করে না শুধু টো টো কোমপানী আর সিনেমা। প্রশ্ন মানে অকথা শিক্ষাগারদ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে ভরা নতুন কলমে যে লেখা লেখে তার হদিশ রাখে কে?

এই কলেজের ছাত্র অধ্যাপকদের যুগ্ম-সহযোগীতায় যাতে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভা সমীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয় আমরা সেজন্য তৎপর হবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি।

কবি শঙ্খ ঘোষ সম্প্রতি সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার পেলেন। শঙ্খ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। পঞ্চাশের দশকের কবি। "বাবরের প্রার্থনা" কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। 'নিঃশব্দের তর্জনী' 'ছন্দের বারান্দা' 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ' তাঁর উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ পুস্তক। বইগুলিতে তিনি বাংলার কবিতার ছন্দ শহ কবি কল্পনা রবীন্দ্রনাথের নাট্য কলা নিয়ে মননশীল আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষা যেমন বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস তেমনই দৃষ্টি ভঙ্গীর মৌলিকতায় তিনি গদ্যের ভেতর একটা ঋজু বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সঞ্চার করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে আমরা আমাদের সঙ্গীত নৃত্য জগতের তিন তারকাকে হারিয়েছি। ভীষ্মদেব নজরুল প্রভৃতি গীতিকারের বাংলা গানে একটা সুমধুর শৈলী এনেছিলেন। ওস্তাদী ভঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়েছিলেন বাঙ্গালীয়ানার যাদু। উদয়শঙ্কর প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলাকে এবং সাম্রাজ্যবাদ শোষিত আধুনিক জনজীবনকে তাঁর সৃজনশীল নৃত্যের মধ্যে রূপায়িত করেন। পঙ্কজ কুমার মল্লিক সাধারণ শ্রোতার সমাজে রবীন্দ্র সঙ্গীত ধারার ভগীরথী। আধুনিক বাংলা গান বলতে গেলে তিনিই গেয়েছিলেন 'ও কেন গেল চলে কথা টি নাহি বলে মলিন মুখে"।

সমস্ত মানুষের মনে এই সন্ধানী প্রশ্ন আজ জাগছে। সুখের বিষয় সরকার এ বিষয়ে সচেতন এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে পশ্চিমবাংলার জনজীবনকে নিরাপদ করবার জন্য সক্রিয় হ'তে নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত বাঙ্গালীর হয়ে ভারতীয় অর্থনীতির এক মূল্যবান অঞ্চল এই রাজ্যের পক্ষ থেকে আজ সমস্ত ছাত্রসংস্থা ছাত্র সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, শিক্ষা জগতের প্রতিটি সংস্কৃতিবান মানুষ আওয়াজ তুলেছেন বাংলার মাটিতে এমন একটি ঐতিহাসিক ধ্বংসলীলার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে এবং এজন্য স্থায়ী অর্থনীতিক ভিত্তি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হোক

আমি সমস্ত ছাত্রবন্ধুর কাছে ছাত্রসংস্থার কাছে মানবিক আবেদন জানাই যে এবারের এই শিক্ষায়তনের নির্দিষ্ট বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—"কলেজ সোশ্যাল"- ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা বাতিল ক'রে তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান ক'রে আমাদের এই ঐতিহ্যবান মহা বিদ্যায়তনের অতীত গৌরবকে অটুট অক্ষুন্ন উজ্জ্বল রাখুন। ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ'।

কোশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(সম্পাদক : শিক্ষক সংসদ : আশুতোষ কলেজ)

আগুন রাঙা অকাল ঝরা ফুল : সুকান্ত	দেবাশিষ দাশগুপ্ত	৭৩
Sonnet	Prof Ajit Krishna Basu	৭৭
অজ্ঞাত রমনীরে	দিবেন্দু কুমার বারিক	৭৮
গৌর চন্দ্রিকা	ডাঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	৭৯
শিক্ষা সমীক্ষা	অধ্যাপক অজয় কুমার সেন	৮৩
আশুতোষ কলেজ সমাচার	—	৮৬
চয়ন	—	৮৯
প্রতিবেদনে	সোমনাথ বসু	৯১
সাধারন সম্পাদকের কলমে	পল্টু দেবরায়	৯২

আমরা কত বড়

দুলাল কৃষ্ণ সরকার
অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

জন্ম সময়ে আমরা যে দেহখানি নিয়ে পৃথিবীতে স্থান পাই, তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ গুণ হয়ে ওঠে। এ বৃদ্ধি ঘটে পৃথিবীকে শোষণ করে। কেননা প্রতিদিন যে পরিমাণ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আমরা গ্রহণ করি, তার থেকে কিছু অসার অংশ বাদ দিয়ে শরীর বাকী অংশ শোষণ করে নেয়। আমাদের এ আহার্য্য আসছে পৃথিবী থেকে তাই এক কথায় পৃথিবীকে আমরা শোষণ করে চলেছি। সারা জীবন ধরে শোষণ করেও অবশ্য আমরা ষাট-সত্তর কিলোগ্রামের বেশী পদার্থ ধরে রাখতে পারি না আর মৃত্যুর পর আবার সবই পৃথিবীকে ফেরত দিয়ে যাই। যখন শোষণ করি তখন কতখানি করি?

মাত্র বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের সময়য়ে উদ্ভূত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের বস্তুগুলি। আমাদের শরীরেও এই মৌলিক পদার্থের কতকগুলির পরমাণুরা একে একে আশ্রয় পেয়েছে। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফস্‌ফরাস কার্বন, লোহা, চুণ ইত্যাদি অন্যান্য পদার্থের পরমাণুরা বিভিন্ন সংখ্যায় আমাদের শরীরের মধ্যে কাজ করে চলেছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় কার্বন পরমাণুর ভর বার গুণ বেশী, নাইট্রোজেন পরমাণুর চৌদ্দগুণ, অক্সিজেনের ষোল গুণ, ফস্ফরাসের তিরিশ গুণ, চুণের চল্লিশ গুণ এবং লোহার ছাপ্পান্ন গুণ বেশী। শরীরের মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন অক্সিজেন, চুণ—এদের পরিমাণ অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। সুতরাং এদের সকলের সম্মিলিত ফল হিসাবে যদি গড়ে প্রতিটি পরমাণুর ভর হাইড্রোজেনের পরমাণুর পনের গুণ ধরা যায় তবে একটি লোকের শরীরে কতগুলি পরমাণু থাকতে পারে, তা অনুমান করা যায়।

এক গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে যতগুলি পরমাণু থাকে, বারগ্রাম কার্বন, কিংবা ষোল গ্রাম অক্সিজেন ইত্যাদির মধ্যেও ততগুলি পরমাণু থাকবে। এই পরমাণু সংখ্যা সবক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে বলে একজন বৈজ্ঞানিকের নামে এর নাম হয়েছে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা। সুতরাং পনের গ্রাম দৈহিক পদার্থের মধ্যেও এই অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার পরমাণু থাকবে। কোনো লোকের ওজন যদি ষাট কেজি অর্থাৎ ষাট হাজার গ্রাম হয়, তবে পনের গ্রামের তুলনায় তা চার হাজার গুণ বেশী। অতএব

দেড় হাজার ডিগ্রীতে লোহা, চৌত্রিশ শ' ডিগ্রীতে টাংষ্টেন, সবশেষে সাইত্রিশ শ' ডিগ্রীতে কার্বণ গলে যায়; আর বাষ্প হ'তে তামার লাগে ছাব্বিশ শ' সোনার ও লোহার লাগে তিন হাজার, কার্বণের লাগে আটচল্লিশ শ' এবং সবশেষে টাংষ্টেনের লাগে উনষাট শ' ডিগ্রী। আর সূর্য্যের বহিরাবণের তাপমাত্রাই হচ্ছে ছয় হাজার ডিগ্রী। ভিতরের দিকের উত্তাপ আরও, আরও বেশী—বিশ হাজার-পঞ্চাশ হাজার-এক লাখ-বিশ লাখ-এক কোটী-ছ কোটী ডিগ্রী! এই ভীষণ উত্তাপে উত্তপ্ত বাষ্প রাশি সূর্য্যের দেহকে করেছে এক উত্তাল, উদ্দাম বাষ্পসমুদ্র। যে তেজোরাশি সূর্য্য চতুর্দিকে বিলিয়ে দিচ্ছে তা হচ্ছে পাঁচশ কোটী কোটী অশ্বশক্তির সমান। আমাদের পৃথিবী—এর এক কণা, প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষ অশ্বশক্তি পরিমাণ শক্তি প্রতি বর্গ মাইলে পাচ্ছে। এই সামান্ত দাক্ষিন্যেই রক্ষা পাচ্ছে পৃথিবীর জীবকুল।

সূর্য্যের এই শক্তির উৎস হচ্ছে তার দেহের হাইড্রোজেন পরমাণুরা। অভ্যন্তরের প্রচণ্ড তাপ এবং চাপে চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে গঠিত হচ্ছে একটি হিলিয়াম পরমাণু: এতে একটুখানি পদার্থ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে অনেকখানি শক্তি হিসাবে, এবং যা বিকিরণ হচ্ছে চারিদিকে। সূর্য্যের এই হাইড্রোজেন শেষ হতে সময় লাগবে আরও পাঁচশত কোটী বৎসর। তারপর সূর্য্য নিস্প্রভ হয়ে আসবে, বিকিরণ কমে যাবে, সূর্য্যের আকর্ষণে আরও পদার্থ এসে জড়ো হবে তার গায়ে, সূর্য্য বৃদ্ধ হয়ে বিরাট আকার লাভ করবে। তখন তাঁর নাম হবে লোহিত দানব।

বর্তমানের এই মধ্যবয়সী সূর্য্য খুব বিশাল নয়। নক্ষত্র রাজ্যে তাই একে বামন বলা হয়। এরও একশ গুণ বড় নক্ষত্র মহাকাশে অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, এমন কি ছ হাজার গুণ বড় নক্ষত্রও বিরাজমান। প্রত্যেক নক্ষত্রেরই রূপ সূর্য্যের মত বিশাল বিশাল অনলাধার: উত্তাল, উদ্বেল বাষ্পরাশি পিণ্ড। মাত্র যারা মৃত্যু পথযাত্রী তারা বিকিরণ স্তিমিত করেছে বা অদৃশ্য হয়েছে। এমনি ধরনের ছোট বড় অসংখ্য নক্ষত্রদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক সুবিশাল নক্ষত্রজগতে। আমরা এবং আমাদের সূর্য্য যে নক্ষত্রজগতের অধিবাসী তার নাম ছায়াপথ, ইংরাজীতে বলে Milky Way Galaxy। আন্তনক্ষত্র অঞ্চলে যে অল্পবিস্তর পদার্থ আছে, তার থেকেও একটা অস্পষ্ট আলোর আভাষ ভেসে আসে আমাদের চোখে, এবং আকাশে পূর্ব-পশ্চিম দিকে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়; তাই এই নক্ষত্রজগতের এমন সুন্দর একটি নাম হয়েছে। নক্ষত্ররাজ্যের যে অঞ্চলের উপর সূর্য্যের আধিপত্য বিস্তৃত, অর্থাৎ সে অঞ্চলের মধ্যে অন্য কোন পদার্থ প্রবেশ করলে, সূর্য্যরাজের চির আনুগত্য অবলীলাক্রমে স্বীকার করে, তা সূর্য্য থেকে সবদিকে প্রায় চৌদ্দলক্ষ কোটি মাইল। আলোককে দূত হিসাবে ব্যবহার করলে সূর্য্যরাজ্যের রাজধানী থেকে রাজ্যের সীমান্তে পৌছুতে দূতের প্রায় অড়াই বৎসর সময় লাগবে। আলোক দূত প্রতি বৎসরে অক্লান্ত ধেয়ে ছয় লক্ষ কোটি মাইল যেতে পারে। এই দূরত্ব আলোকবর্ষ নামে পরিচিত। সূর্য্যের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্ররাজ, 'আলফা-সেন্টাউরি'

এই মহাবিশ্বের কোথাও বা কোনো নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটছে, কোথাও বা কোনো নক্ষত্রের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটছে, আবার কোথাও বা কোনো নূতন নক্ষত্রের অভ্যুদয় ঘটছে। এ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলেছেই। এটা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এমন সামান্য ব্যাপার যে সেই নক্ষত্রজগতেই তার কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বলে মনে হয় না, বিশ্বজগতে তার প্রতিফলন উপলব্ধির বাইরে।

গত দশকের গোড়ার দিকে সুদূর এক প্রকার বস্তুদের চিহ্নিত করা গিয়েছে; এদের একটু অদ্ভুত রকমের ব্যবহার দেখে এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কোয়াসার' অর্থাৎ অর্দ্ধ-নক্ষত্র। ধারনা করা হচ্ছে এরা বুঝি বিশ্বজগতের বহিঃসীমার অধিবাসী। এদের থেকে আলো আসতে লাগে আটশত কি হাজার কোটি বৎসর। অর্থাৎ আজ যে কোয়াসারকে দেখছি তা ঐ আটশত বা হাজার কোটি বৎসরের পুরাতন, বর্তমানের নয়।

আমাদের ছায়াপথ যে নক্ষত্রজগত তা আজকের এই আকারে এসেছে হাজার কোটি বৎসর আগে। সুতরাং কোয়াসোরের যে আলো আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সে আলো যেদিন কোয়াসার থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছে তখনও আমাদের সূর্য এবং পৃথিবী জন্ম নেয় নি। সেই আলো যখন প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রম করে চলে এসেছে, তখন সূর্যসহ পৃথিবী তপ্ত বাষ্প পিণ্ডাকারে জন্ম পেয়েছে। পৃথিবী বহু বৎসর ধরে শীতল হয়ে হয়ে পাতলা আস্তরণে আবৃত হয়েছে, আর তারও বহু বৎসর পরে পৃথিবীর বুকে জীবনের স্ফুরণ হয়েছে। নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে শত সহস্র প্রকার জীব ও বৃক্ষলতা তাদের বর্তমান রূপ পেয়েছে। এদেরই মধ্যে একপ্রকার জীব, নাম যাদের মানুষ, তারা অসভ্য থেকে সভ্য হয়েছে, তাদের প্রবীন এবং নবীনেরা তাদের উদারতা, দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, সংকীর্ণতা ও শঠতা নিয়ে, বিশ্ব সংসারের কোন এক অজানা কোণে পৃথিবী নামে যে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ কণিকা ভেসে বেড়াচ্ছে, তার বুকের কোথাও কেহ বা দর্পভরে কেহ বা অবাক বিস্ময়ে বিচরণ করে চলেছে।

সাহিত্য ও রাজনীতি

জয়দেব ভট্টাচার্য্য
৩য় বর্ষ-কলা বিভাগ

কয়েকদিন আগে এক রেষ্টুরেন্টে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ভদ্রলোক টেবিল চাপড়ে চা চল্‌কিয়ে, পাশের কেবিনের পনের বছরের যুঁইকুড়ির মত এক কিশোরীকে চমকে দিয়ে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে সমালোচনা করলেন। তাঁর মতে, নীরেন চক্কোত্তি অ্যাকাডেমী পাবার আগে ও পরে সমসাময়িক রাজনীতির ওপর কোন সুচারু বা অম্লমধুর মন্তব্য করেননি, ফলত তেরজন কবির স্বপক্ষে আর সাতাশ জন বিপক্ষে হয়ে একটি ধুন্ধুমার কাণ্ডের সূচনা করলেন।

উসোখুসো দাড়ি আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়ানো চুল, পাঞ্জাবীতে চায়ের দাগ ধরা সতের-সাতাশ বরসী তরুণ থেকে কুঁজো ওয়ার্ডসওয়ার্দিয়ান অধ্যাপকেরা সকলেই এখনও এই একটি বিষয়ে সঞ্জীবিত, ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ ও প্রেমাক্ত হয়ে ওঠে, বিষয়টি হল সাহিত্য ও রাজনীতি—তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দেয়ানেয়া আবাহন-বিসর্জন চাপাচাপি ইত্যাদি।

এতাবৎ জ্ঞাত অজ্ঞাত সব বিষয়ে যিনি এককভাবে প্রাথমিক কথা বলে গেছেন তিনি হলেন গ্রীসবাসী এ্যারিষ্টটল। তিনি বলেছিলেন, কোন মানুষই রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হয়ে বাঁচতে পারে না। সুতরাং এই বাঁচারকাহিনীতে রাজনীতিই মুখ্যমন্ত্রী অন্যরা ক্রীড়া, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক শিক্ষার অদি-মন্ত্রী, সেই মূল—তাকে ঘিরেই ঘূর্ণন, মরণ বাঁচনের যাবতীয় খেলা।

কিন্তু যদি ভাবা যায়—এক মনোরম উপত্যকা ওপাশে নীল পাহাড়, শ্যামল অরণ্যানী নির্মল আকাশ, বোহেমিয়ান মেঘ ও এক পর্ণকুটীর, যাতে এক বৃদ্ধ বাস করেন; তাঁর শারীরিক প্রাত্যহিকতার পর সময় কাটে গাছ নিয়ে, মেঘের উদাসীন চলাফেরা দেখে নিজের পোঁতা চারাধানের পরিচর্যা করে এবং ঝর্ণার মাছের উচ্ছল ছল ছল সাঁতরানো দেখে, তাঁর সাথে রাজনীতির সাহিত্য কদ্দূর? প্রশ্ন করা যেতে পারে, এখানে সাহিত্যই বা কোথায়? ঐ যে মায়াবী আকাশ তার রামধনু, এই ঋতু বদল ও ঝর্ণার নুড়ির টুং টাং জলের কল্‌কল্, পাহাড়ের অটলতা, অরণ্যের ঘনান্ধকার রহস্য—একি সাহিত্য নয়? সাহিত্যের উপজীব্য নয়?

অবশ্য পাখার হাওয়া খেতে খেতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের থেকে ভেসে আসা 'বিচার চাই বিচার চাই' শুনতে শুনতে আগের পরিবেশ নিতান্তই 'কবিতা কল্পনালতা' বলে মনে হয়।

মধ্যে বিহার কি উত্তর প্রদেশে নেমে যাবে, এই পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তে, ঘরে ফেরার ক্ষণে সবুজ ধানের সাথে, হাওয়ার মাতলামোর সাথে তাল মিলিয়ে যখন গাড়ী কুঝিক্‌ঝিক্ অদূরে, তখন পাশে কাকা কম্পার্টমেন্টে গুটিশুটি বসে কার কাছে গল্প শুনবো আমরা ? সেই চাঁদমামা, রাম-সীতা, ভীম-হিড়িম্বার গল্প কে বলবে ? তখন রাজনীতি কোথায় ?

"আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী ; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি।"

— বিবেকানন্দ

কাছেই সমান কিন্তু মাত্রার হেরফেরের নিমিত্তই কারুর কাছে তা বেশী কারুর কাছে তা কম। এই মাত্রার হেরফেরের রাজনীতি সেই একই মানযিক মূল্যবোধেয় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে থেকেও সর্বত্র সমান নয়। তা সে যাই হোক ফল কথা এই যে মানবিক মূল্যবোধকে ভিত্তি করেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার উদ্ভব, আর তাই যদি হয় তবে একথা আমরা বলতে পারিনা যে মানবিক মূল্যবোধগুলি রাজনৈতিক সংসর্গমুক্ত। কিন্তু তাই বলে একথা আমরা স্বীকার করে নিতে পারি না যে মানবিক মূল্যবোধগুলির বিশ্লেষণে শুধু মাত্র রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ জীবানন্দ ও ষোড়শীর প্রেমের কথা ধরা যাক, এই প্রেম বিশ্লেষণে কি আমরা একবারও দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করি। অবশ্য কেউ যদি একথা বলেন যে ষোড়শীর পরিপূর্ণতার মাধ্যমে ষোড়শীর যে উন্নয়ণ তা দেশের তথা সমাজের উন্নয়ণ তো বটেই অতএব পরোক্ষভাবে দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা তো রয়েছেই। এযেন বড় কষ্টকল্পিত।

অতএব আমরা এই মতে উপনীত হতে পারি যে সাহিত্য রাজনীতিতে যোগ থাকবে বটে কিন্তু রাজনীতির খোলসে যেন সাহিত্য প্রবিষ্ট না হয়।

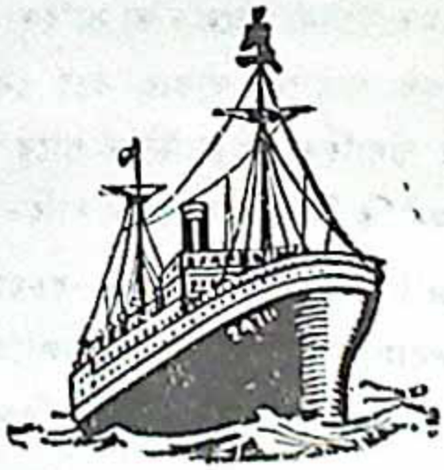

'যিনি অগ্রে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না এবং এক মুহূর্ত বৃথা অতিবাহিত করেন না, তিনিই পণ্ডিত।"

—বিদুরের উক্তি—মহাভারত

"শতবর্ষের আলোয় শরৎচন্দ্র"

শ্রীদীপক দত্ত
প্রথম বর্ষ স্নাতক-কলা বিভাগ

শরৎচন্দ্রই বোধ করি বাংলা সাহিত্যের সেই অনন্য একক, যাঁর জীবন ও সাহিত্য সমার্থক। নিশ্চিত ও নিরাপদ, আর্থিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের শক্ত জমিতে দাঁড়িয়ে কল্পনার ফুল ফোটাননি তিনি অথবা মানুষের বেদনার সঙ্গে সংযোগ বর্জিত তথা কথিত অতি বাস্তব রচনার নামে বিদেশী সাহিত্যের বেনামী ব্যবসাদারী করেননি।

শরৎচন্দ্র আচারে আচরণে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাঁর রচনায় বাঙালী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের সুখ-দুঃখের উপস্থিতি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। সামান্য কুড়ি টাকার-জন্য এফ এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। সংসার সমুদ্রে অসহায় হয়ে তিনি ভেসে পড়েছেন দূর প্রবাসে, ব্রহ্মদেশে। দেশ ছাড়ার আগে তিনি মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে 'মন্দির' গল্পটি প্রকাশ করেন (১৯০৩)। দীর্ঘ তের বছর বাদে হঠাৎ বাংলা সাহিত্যের আসরে তার ডাক পড়ে। ইতিমধ্যে অবশ্য 'ভারতী' পত্রে ছদ্মনামে 'বড়দিদি' (৯০৭) ছাপা হল। রবীন্দ্রনাথ এটি পড়ে মুগ্ধ হন। এর বছর কয়েক পরে শরৎচন্দ্র স্বনামে 'যমুনা' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। 'রামের সুমতি', 'কাশীনাথ' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম পাঠক মহলে পরিচিত হয়ে উঠে। এরপর তিনি প্রকাশ করলেন 'চরিত্রহীন'। তাঁর 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে সাড়া জাগাল। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যাকাশের মধ্য গগনে। ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে স্বীকৃত হলে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীকান্তের' ইটালীয় অনুবাদ পড়ে মনীষি রোমা রোঁলা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়— সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।'

"যাঁহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তাঁর ক্ষতি নয়, মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি ॥"

এতো ভয়। বাড়ির সবাই তখন ঘড়ের চালে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে ওঠা শুরু করে নিয়েছে। আর গরু বাছুরগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে। বানে ভেসে যেখানে স্থান পাবে সেখানে বাঁচার জন্য। সংসারের একটা কানাকড়ি যদি চুরি হয়ে যেতো, তাহলে বাড়ির মালিক ঘরের মেয়েদের কতো বকুনি দিতো। কিন্তু এখন সব জিনিষ ফেলে গেলেও কিছু বলছে না, এখন এমন সময়। তারপর বন্যার জল গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে চললো। কিন্তু বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আমরা যেন প্রকৃতির কাছে নিরস্ত্র শিশু। বিজ্ঞান তোমার মুখ তুলে চোখ খুলে দেখোতো এখানে তোমার কোন বিদ্যা খাটে কি না? ওষুধ সৃষ্টিকর্তা জানেন কিন্তু কাউকে জানান নি। তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেলো। চারিদিকে কেউ বলছে—"আমার খোকন দুলে ভেসে গেলে, আবার কেউ বলছে আমার স্বামী গেলো, কেউ বা চিৎকার করে ভগবানকে বলছে—"ঠাকুর তোমার খেলা শেষ করো"। যার যা যায় কেউ আর তাকায় না। মনে হচ্ছে মানুষগুলো যেন কলকাতার রাজপথে বাঘা বাঘা ট্রাম বাসের তাড়া খাওয়া পশু কিন্তু তাতো নয় এরা তো গ্রামের মানুষ। এরা নিজের দুঃখ সইতে পারে না—আবার পরের দুঃখ দেখতে সইতে পারে না—আবার পরের দুঃখ দেখতে পারে না। কতো জীবের যে অকাল মৃত্যু ঘটলো তা বলা মুশকিল। এমত.বস্থায় যারা আমাদের চিরশত্রু তারাও আজ আমাদের মিত্র। বিষধর সর্পকুল আমাদেরই পাশে আশ্রয় নিয়েছে। হঠাৎ মাকে জিজ্ঞেস করলাম—"মা সাপে কামড়ে দেবে সরে এসো।" মা দুঃখের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—"না রে বাবা এখন সবাই সবাইয়ের বন্ধু। ওরা কামড়ে পালাবে কোথায়?" চিন্তা দূর হলো, তবে কাছে এলে বড় ভয় করে। কারণ যার যা স্বভাব সে কখনো ছাড়ে না,—মা যতই বলুক না কেন, বেলা তখন দুটো বন্যার জল আস্তে আস্তে কিছুটা কমতে শুরু করলো। গ্রামের গাছপালা আবার যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। শেষ বেলায় এসে দেখি আর কিছুই নেই। ঘরবাড়ী ভেসে গেছে মাটির বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জল আবার নদীর কুলে ফিরে যেতে লাগল। যেন দুরন্ত শিশু সমস্ত দিনের খেলা সাঙ্গ করে মায়ের কোলে নিদ্রায় মগ্ন হতে চলেছে। মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম—"ঠাকুর তোমার লীলা বোঝা দায়। তোমার সৃষ্টিকে তুমি কত সুন্দর করে গড়ে দিলে আবার ক্ষনিকের জন্যে কি মনের বিবাদে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে। চির শ্যামল বাংলার এ গ্রাম রামপুরকে কেমন চির বিধবার সাজে সাজিয়ে রেখে গেলে। তোমায় নমস্কার জানাই। কিন্তু ভক্তিতে নয় ভয় গ্রাম বাংলার এ মানুষরা আবার তোমাকে কবে নূতন করে সাজাতে পারবে জানি না। এই আশা প্রাণে নিয়ে বেঁচে থাকো। বন্যা দেখার সাধ আমার পূর্ণ হলো। কিন্তু বাঁধ দেবার সাধ যে এখনও মিটল না। কবে দেখব মানুষের সাধনায় এই রাক্ষসী নদীকে শাসন করে লক্ষ্মী মেয়ের মত ফসলের মাঠে নামিয়েছে, তার পায়ে বাজছে ধানের নূপুর।

On The Creative Process

Prof Ramendra Nath Dutta
Dept. of English Language & Literature

The man of letters is distinguished from the ordinary mortals by his superior sensibilities ; nay, his 'divine' gift of creativity. It is a 'divine' gift for God is the first and the supreme creator, the creator of the universe The man of letters is endowed with this attribute—he can, as Caudwell says quite rightly, 'create something out of nothing' To give to "airy nothings a local habitation and a name", is indeed his sole task and delight His creations have given men pleasure down the centuries and will remain a source of perennial pleasure Yet at the same time men have wondered at how the man of letters created his pieces This has aroused men's curiosity to probe into the process of creation, the mysterious working of the human mind But no comprehensive and satisfactory understanding ensued The creative artists all over the world pondered on how they actually produced their masterpieces We may here attempt at a systematic analysis of their probes and consequent findings in order to get nearest to truth or at best, provide ourselves with a workable hypothesis.

In the earliest stages of critical thinking not much serious attention was paid to the problem of the creative process. The reason perhaps lies in the fact that art or artistic activity was then regarded as a subsidiary or secondary activity, or inferior accomplishment The first notable thought on the matter is found in a celebrated speech in Plato's Ion, which likens the poet to a magnet, radiating a kind of divine power (theia dunamis) out through a chain iron rings, the rhapsode and his audience. Both poets and rhapsodes utter what they do by a divine dispensation, a form of madness. This is what Plato says : "For the poet is a light and winged and holy thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his senses, and the mind is no longer in him : when he has not attained to this state, he is powerless and unable to utter his oracles"

and to unify It is essentially vital, even as all objects are essentially fixed and dead." Wordsworth also says in this connection : "The imagination also shapes and creates ; and how ? By innumerable processes ; and in none does it more delight than in that of consolidating numbers into unity, and dissolving and separating unity into numbers,– alternations proceeding from, and governed by, a sublime consciousness of the soul in her own mighty and almost divine powers" Wordswork in his 1800 Preface, after twice invoking the 'spontaneous overflow of powerful feelings' adds the tempering phrase 'emotion recollected in tranquillity, and he touches the same note in his verse :

"And then my heart with pleasure fills
And dances with the daffodils"
(The Daffodils)

"The music in my heart I bore
Long after it was heard no more"
(The Solitary reapex)

Wordsworth's metaphor, 'spontaneous overflow of powerful feelings' suggests the analogy of a container, which is obvirously the poet's mind. The materials of the poem come from within ; they are not inherent in the objects or actions, but in the feelings of the poet This extreme consequence of such a theory is "the elimination for all practical purposes, of the conditions of the given world, the requirement of the audience, and the rejection of art" Another extreme possibility of such a theory may be that poetry must come as naturally as leaves grow on a tree In his postscript to The Waggoner he postulates a "shy spirit" as the begetter of the verse

"Nor is it. I who play the part,
But a shy spirit in my heart,
That comes and goes—will sometimes leap
From hiding places ten years deep."

Wordsworth, however, certainly did not conceive of the great poet as a thoughtless and instinctive child of Nature. Poetry is not "an out-moded luxury trade" or a "functionless vestige of a primitive mentality."

accents of its utterance. Wordsworth's poet is a person who is "singing a song in which all human-beings join with him" The act of creation does not always require gross stimuli from without In this connection it would be worthwhile to say a few words on wordsworth's concept of imagination as the guiding principle of creation. This position seems to be very close to that of Kant, for in Kantian aesthetics, imagination operates under the gentle yet firm control of judgement so that it may deliver not a mere copy of an object but an imaginative re-creation of the real. It would be wrong to assume that there is no practical alternative between relying on the spontaneous promptings of nature and the arbitrary and capricious fiat of the poet. There is no evidence to suggest conclusively that Wordsworth believed the poetic process to be independent of valid principles He was by no means a believer in a mysterious poetic process upon which no calculation whatever, can be made All the powers which he attributes to imagination—conferring, abstracting, modifying, shaping and creating —work towards a common goal, to dispossess the object almost of a corporeal existence. To describe the imaginative process Wordsworth quotes the following lines from Resolution and Independence :

"As a huge stone is sometimes seen to lie
Couched on the bald top of an eminence.
Wonder to all who do the same espy
By what means it could thither come,
and whence,
So that it seems a thing endued with sense.
Like a sea-beast crawled forth, which on a shelf
Of rock or sand reposeth there to sun itself,
Such seemed this man, not all alive or dead,
Nor all asleep, in his extreme old age."

In the images, Wordsworth says, "the conferring, the abstracting and the modifying powers of the Imagination; immediately and mediately acting, are all brought into conjunction." The images of the stone and the sea-beast, not arresting in themselves, are not developed independently, They react vitally upon each other. The result is an imaginative account neither of stone nor of sea-beast ; nor is it simply of a man, but rather of

illustrate his idea of the creative process is worth quoting : " the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence, like an inconstant wind, awakens to transitory brightness : this power arises from witnin like the colour of a flower which fades and changes as it is developed, and the conscious portions of our natures are unprophetic either of its approach or its departure. Could this influence be durable in its original purity and force, it is impossible to predict the greatness of the results ; but when composition begins, inspiration is already on the decline and the most glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conceptions of the poet " In the same vein he goes on a few pages after : "Poets and the hierophants (the minister of 'reveltion' or the priest who expounded sacred ceremonies in ancient Greece) of an 'unapprehended inspiration ; the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present ; the words which express what they understand not ; the trumpets which sing to battle and feel not what they inspire ; the influenee which is moved not. but moves Poets are the unacknowledged legislators of the world " In all these sayings one thing is clearly evident – Shalley believes in rhe spontaneity of creative activity In the Defence he asserts his view in a categorical statement : "I appeal to the greatest poets of the present day whether it is not an error to assert that the finest passages of poetry are produced by labour and study". In this connection, it would be interesting to note in passing that Keats also valued spontaneity in art, for in a letter he said, "If poetry does not come as naturally as leaves to a tree it had better not come at all". Yet, the interesting point is, that neither Shelley nor Keats produced their masterpieces in a thoroughly spontaneous manner. They very often revised their original versions, clipped off words and phrases like any other poet The best lines of Keats's Ode to a Nightingale– 'with beaded bubbles winking at the brim And purple-stained mouth"—were not the original lines

Despite all these cogent thoughts on the problem none of them could specify the details of the creative process The element of mystery is still there It seems, every creative writing cannot be explained in terms of either Coleridge's theory of imagination or Wordsworth's formula. Can we really explain the genesis of Coleridge's fragment, Kubla Khan, in the light of the romantic theories of creation ? One day the poet fell into a stupor.

conscious (the deliberate) and the unconscious mind in the act of creation. To him, creation implies a kind of continual surrender of the creative artist himself to something which is more valuable—'the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality." And he thinks it is in this 'depersonalisation', that art, in a sense, approaches the condition of science. In this connection Eliot puts forward a suggestive analogy and invites us to consider the action which takes place when a bit of finely filiated platinum is introduced into a chamber containing oxgen and sulphur dioxide. The analogy is that of the catalyst. He goes on to elucidate: "When the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulphurous acid This combination takes place only if the platinum is present; nevertheless, the newly-formed acid contains no trace of platinum, and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the shred of platinum It may partly or exclusively operate upon the experience of the man himself; but, the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates; the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material" Emotion and feelings, he says, are the elements that enter the presence of the transforming catalyst. The poet's mind is in fact, "a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together." The poet, he says, has uot a 'personality' to express, but "a particular medium. which is only a medium and not a personality, in which impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways." Eliot thus lays much emphasis on the euexpected and strange method of combination and fusion in the creative process In the process of creation the emotions are worked up "to express feelings which are not in actual emotions at all." This goes directly against Wordsworth's definition of poetry as "emotions recollected in tranquillity." Eliot says; "__it is neither emotion nor recollection nor, without distortion of meaning, tranqnillity. It is a concentration, and a new thing resulting from the concentration, of a very great number of experiences which to the practical and active person would not seem to be experiences at all; it is a concentration which does not happen consciously or of deliberation.

আমার মা

সোমনাথ গুপ্ত
প্রথম বর্ষ কলা বিভাগ

এই পৃথিবী কোলে নিয়ে, আমার মা
মক্কা বেথেল হেম
লুম্বিনীতে ছেলে কোলে
আমার মা !

জগৎ জুড়ে স্নেহের সুরে ডাকছে কাছে
আমার মা আমার মা !
মিষ্টি মধুর হাসির ছোঁয়া বিশ্বময় ছেলের দল
আমার মা !

বারো মাসে তেরো পাবন
ষষ্ঠী পূজোর ব্রত কথা
বারের উপোস করছে কতই
ক্লান্তিবিহীন আমার মা।

সব কিছুতে বিশ্বাসে তার
দুঃখে ভাবে তার বরাত
শ্যাম সৈয়দের পয় ছুঁয়েছে
আমার মা !

চোখ দুটিতে অসীম মায়া
বুকখানিতে বিশ্বসুধা—
আপন দুখে আঁচল টেনে
দাঁড়িয়ে আছে আমার মা !

অ্যারোনা ॥ আপনার এ মনোভাব সভ্যতার প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ প্রসূত।

নিমো ॥ সভ্যতা সম্বন্ধে আমার ধারণা যখন বুঝেই ফেলেছেন তখন এ আলোচনা থাক। আসুন একহাত চেস্ নিয়ে বসা যাক্। না কি পিয়ানো বাজাব। আপনারতো সংগীত অনুরাগ প্রবল।

অ্যারোনা ॥ রসিকতা আপনার মর্মভেদী নয়, তবে চর্মভেদী, কোনটাই আমার ভাল লাগে না।

নিমো ॥ আমার রসিকতা যে আপনাকে আহত করেছে তার জন্য আমি দুঃখিত। মাত্রা জ্ঞানটা আমার একটু কমই।

অ্যারোনা ॥ কিন্তু আমাদের সহ্যের মাত্রা যে খুব বেশী একথা ভাববেন না। আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

নিমো ॥ মাপ করবেন অধ্যাপক। বলেছি ত নটিলাসে দুর্ভাগ্যবশতঃ যারা আসে বাইরে যাবার পথ তাদের কাছে রুদ্ধ।

অ্যারোনা ॥ তাহলে কি এই সাবমেরিনের গহ্বরেই আমরা পচে মরব?

নিমো ॥ আপনার দুর্ভাগ্য। ও নিয়ে অনর্থক ভাববেন না। লাভ হবে না।

অ্যারোনা ॥ তাহলে আপনাকে অমানুষ বলাটা খুব একটা অসঙ্গত হয়নি।

নিমো ॥ যদি পৃথিবীর স্থলভাগের সভ্যমানুষের পর্যায়ে না ফেলেন তাহলে অমানুষ হতে আমার কোন আপত্তি নেই।

অ্যারোনা ॥ কিন্তু ক্যাপ্টেন, ভেবে দেখুন, আপনার নটিলাস সমস্ত পৃথিবীকে অবাক করে দিতে পারে। এর রহস্য প্রকাশ করে দিন। মস্তিষ্কে বিশ্বকর্মাকেও হার মানিয়েছেন আপনি।

নিমো। অধ্যাপক, নটিলাসের রহস্য প্রকাশ করবার সদিচ্ছে আমার নেই। যে ব্রত সে নিয়েছে তা পালন করতে সে বদ্ধপরিকর।

অ্যারোনা ॥ সে ব্রত কি স্কোশিয়া'-র সলিল সমাধি, 'শ্যানন' জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। ওঃ কালকের সে দুঃস্বপ্ন আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এক মুহূর্তেই এক হাজার মানুষ ভর্তি জাহাজটা মাঝ সমুদ্রে তলিয়ে গেল, কি নির্মম, নৃশংস, এ এক ধরণের উন্মত্ততা।

নিমো ॥ নটিলাস আমার এক আত্মা অধ্যাপক। সমুদ্র পৃষ্ঠে সভ্য মানুষের কোন জাহাজের তলদেশ দেখে যখন আমার চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে তখন অনুগত নটিলাস বোঝে তার কি করণীয়, বিপুল আক্রোশে সে তার শিকারের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার এত দুঃসাহস উন্মত্ততা ছাড়া কি সম্ভব!

অ্যারোনা ॥ ইচ্ছে করলে নটিলাস ভালো কাজেও লাগত। নিজেও পেতেন সম্মান, অর্থ, যশ।

অ্যারোনা ॥ পরিকল্পনা অভিনব। তবে কষ্ট কল্পনা। কিন্তু মানবিকতার দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, এভাবে নিরীহ লোকগুলোকে মারতে আপনার কষ্ট হয় না ?

নিমো ॥ হয়না বলবনা। কিন্তু এ বিধাতার আদেশ, সভ্য মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত নিয়তি। আমি তার প্রেরনাতেই কাজ করি।

অ্যারোনা ॥ আমার এটাই আশ্চর্য লাগে, পৃথিবীতে এত যুদ্ধ, এত বিপ্লব, অভ্যুত্থানে যে সভ্যতা এতটুকু পাল্টালো না তাকে আপনি এই সমুদ্রের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে থেকে কি করে সংস্কার করবেন।

নিমো ॥ আপনার মনে আছে অধ্যাপক কাল সমুদ্রের গভীরের একটা উত্তপ্ত অংশ আমরা অতিক্রম করেছিলাম।

অ্যারোনা ॥ হ্যাঁ, সমুদ্রের কয়েক হাজার ফ্যাদম নীচে, জল ফুটছিল কয়েক শো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে থেকেও আমি গরমে ছটফট করছিলাম।

নিমো ॥ অথচ সমুদ্রের উপর ছিল শান্ত, নির্বিরোধ। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের অন্তর চেতনার উত্তপ্ত ভাব অমনি করে ফুটছে, শক্তি সঞ্চয় করে হয়ে উঠতে চাইছে একটা বারুদের স্তূপ আর নটিলাস তাতে অগ্নিসংযোগ করতে চলেছে। যথাসময়েই বিস্ফোরণ হবে। একটা আণবিক বোমার কত শক্তি অধ্যাপক সে মানবিক বোমার কাছে তা তুচ্ছ। আর সেই অন্তরচেতনার যে অংশে ভালোর তপস্যা চলে তা শক্তিবান হবে বিস্ফোরণের পরে, আগে নয়। আপনি, সেই শান্তিকামীদেরই একজন।

অ্যারোনা ॥ কিন্তু ক্যাপ্টেন, আপনার আঘাত যত আনছে চেতনায় তার থেকে অনেক বেশী আনছে প্রাণে।

নিমো ॥ উঁহু, জেসাস ক্রাইষ্টকে যখন মানুষ ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, ব্রুনোকে যখন পুড়িয়ে মেরেছিল, সে আঘাত কি তাদের গায়ে লেগেছিল অধ্যাপক, কিন্তু সেই মৃত্যুতে লাভ কম হয়নি।

নেপথ্যে ॥ ক্যাপ্টেন নিমো — ক্যাপ্টেন নিমো ..সভ্য মানুষের জাহাজ — —... যুদ্ধ জাহাজ... — — অ্যামুনিশানস্ বোঝাই — আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি।

অ্যারোনা ॥ ক্যাপ্টেন .. দোহাই আপনার।

নিমো ॥ আমি নিরুপায় অধ্যাপক। আঘাতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে নটিলাসের ইঞ্জিনঘরে থাকতে হয়। আমি থাকলে নটিলাস ব্যর্থ হয়না। চলি।

অ্যারোনা ॥ ক্যাপ্টেন শুনুন — — ক্যাপ্টেন।

নিমো ॥ ওদের অন্তিম মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান অধ্যাপক।

অ্যারোনা ॥ ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন !

(ক্যাপ্টেন নিমোর প্রস্থান, অধ্যাপক অ্যারোনা মুহ্যমান হয়ে বসে পড়েন)।

হুঁশ ফিরলো এই তো ব্রেবোর্ন রোড ওফ্ ভগবান এতো অসম্ভব সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে শুধু থরথর কাঁপুনি—সারি সারি গাড়িরা সব তাদের দুরন্ত তেজ থামিয়ে রাগে গরগর করে একটু তারপর হঠাৎই সবাই যেন খুব শান্ত হিসেবী হয়ে ওঠে—এই ব্রেবোর্ন রোডের মাটির ওপরে দশ ফুটের মধ্যে যেখানে এতটুকু ফাঁক দেখা যায় সন্তর্পণে সেখানে অন্ততঃ গাড়ীর বাম্পারটা কিম্বা হেডলাইট ছুটো, ঠেলার অথবা রিক্সার হাতল দিয়ে ভরাট করো—খবরদার যেন এতটুকু ফাঁক নষ্ট না হয়—যে সব ফাঁকে ফাঁকে গাড়ীর কোন অংশ নেই সেখানে মানুষ দিয়ে ফাঁক বোঁজাও যেন কোন এক নিপুণ দর্জির সতর্ক কৌশলে ব্রেবোর্ন রোডের মাটির ওপরে দশফুট পর্যন্ত আকাশ বাতাস এখন ভরাট ভরাট নিখুঁত রিপু—

অর্থাৎ এখন, এই মুহূর্তে, আমার ট্যাক্সির আর ব্রেবোর্ন রোডে পড়া হ'লো না সামনে পেছনে ডাঁয়ে বাঁয়ে, শুধু গাড়ী গাড়ী গাড়ী—ঠেলা, রিক্সা, টেম্পো লরি, মিনি ডবল ডেকার মানুষ, মোষ, গরু, ভিখিরী, কেরাণী সব ওলট পালট, এদিক সেদিক, বোঝার উপায় নেই কে কোনদিকে যেতে চায়—বোতল থেকে বেরোতে গিয়ে এক গাদা ক্যাপসুল এলোমেলো আটকে গেছে মুখের কাছে—সবাই বেরোতে চায়, আগে যেতে চায় আমার ট্যাক্সির এখন শুধু হাজার ক্যাপসুলের নীচে কপাল ঠুকে অপেক্ষা। ড্রাইভারের ওপর এখন আর রাগ নেই বেচারা গাড়ীটা এতক্ষণ আমারই মনের মত নিদারুণ অস্থিরতায় ছটফট্ করছিলো—কত গলি ঘুঁজির দু'পাশ হাতড়ে মরিয়ার মত একটু ফাঁক খুঁজেছিলো এখন যেন তার শেষ বাতাস খামচানোর পর হাত পা এলিয়ে পড়েছে- হ্যাঁ ঐ তো বুকের স্পন্দন থেমে গেছে, ইঞ্জিন বন্ধ অসাড় অচল। থৈ থৈ গাড়ীর স্রোতে দমবন্ধ ট্যাক্সি আমার একেবারে তলিয়ে গিয়ে রাশি রাশি পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে নিঃস্পন্দ—আমিও তাই—যে আমি এতক্ষণ সিটের ওপর কাটকাট বসে সামনের সিটের হেলান খামছে অসহায় উদ্বেগে টাইম এণ্ড স্পেশের দুরন্ত দড়ি টানাটানিতে ঘেমে উঠেছিলাম, সেই আমি আবিষ্কার করলাম, দড়ির ওপ্রান্তে আমার প্রতিপক্ষ দড়ি ছেড়ে দিয়েছে—মিঃ নায়েকের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—আর আমি এ প্রান্তে সপাটে আছাড়—সিটে গা ছেড়ে দিয়ে বিধ্বস্ত—আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা যেন অক্ষম আক্রোশে সারি সারি গাড়ির দেয়ালে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে ক্লান্ত, অবসন্ন আমি সিটে হেলে গেলাম—আর তখনই চোখে পড়লো সামনের বাড়ীর ছাদে "রিল্যাক্স—হ্যাভ এ চারমিনার"—

আঃ কি নরম মিষ্টি আহ্বান—কি মনোরম শান্তির বাণী—পকেট হাতড়ে বেরোলো সিগারেটের প্যাকেট—অর্দ্ধস্খলিত হাতে দেশলাই জ্বলে উঠলো, জুড়োতে প্রাণ একগাল ধোঁয়া ছেড়েই মনে হলো সত্যিই এ এক পরম মুক্তির স্বাদ—রিলাক্স-শব্দটাতেই কি অনাবিল হালছাড়া আরাম—মনে হলো সমস্ত ক'লকাতা যেন একটানা দু'শো বছরের দুরন্ত দৌড়ে হতক্লান্ত। সামান্য বৃষ্টি আর ক্লেদাক্ত জমা জলে তার সর্বাঙ্গে এখন স্যাঁতসেতে ক্লান্তির ঘাম এখন রিল্যাক্স কলকাতা—রিল্যাক্স! সমস্ত মুস্কিল আসান একটু বিশ্রাম করো—একটু জিরিয়ে নাও—একটু থেমে থাকো—

করে নিলাম—আচ্ছা এই যে চাকা দুটো আর এক্সহষ্ট পাইপের মুখটা, শুধু ঐ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই তো আমি বুঝতে পারবো এই দুঃসহ থেমে থাকার শেষ কবে, এই কুৎসিত সর্পিলতা নড়ে কি নড়ে না যদি আমার এই জানলার ছোট্ট ফ্রেমের মধ্যে ঐ স্থির ছবিটা একটু কেঁপে ওঠে, আমার মন ছুটে যাবে সেই মুক্তির উৎসমুখ ট্রাঙ্ক রোড আর ব্রেবোর্ণের সংগম স্থলে যেখানে কোন এক অদৃশ্য হাতের আহ্বানে এই বিশাল বোতলের মুখ থেকে সন্তর্পনে বেরোবে এইসব আটক থাকা ক্যাপসুলেরা। প্রথমে সন্তর্পনে অতি নিপুণ টানে বেরিয়ে যাবে ছেঁড়া ছেঁড়া নিঃশব্দ তুলোর মত এইসব দলা পাকানো হাজার হাজার পোষাক পরা মানুষ, তারপর একটা একটা করে লরী, রিক্সা, ঠেলা, ট্রাম, মহিষ, মিনি—তারপর আসবে আমার পালা—আঃ কলকাতা হয়তো একটানা ভিরোনোর পর আবার দৌড়বে।

কিন্তু কই তাতো হচ্ছে না, আমি তো কখন থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি সেই ফ্রেমে বাঁধানো এক্সহষ্ট পাইপ আর চাকা দুটোর দিকে—আমার ক্লান্তি আসছে—চাকা দুটো ঘোরে না কেন একচুলও? আমার বিরক্তি লাগছে পাইপটা নড়ে না কেন একচুলও? —আমি বুঝতে পারছি আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, গলার কাছে একদলা অস্বস্তি দম বন্ধ করে আনছে, অস্থিরতা বাড়তে বাড়তে পিচ্ছিল ঘামে আমি ভিজে যাচ্ছি, ওঃ একটু নড়ে না কেন?— কি এক অসহ্য অক্ষম আক্রোশে আমার মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে একি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি?— নয়তো আমি একি দেখছি?—

আমার সামনের এই লরিটার পেছনে কখন নিঃশব্দে রাজ্যের সমস্ত গাড়ী একে একে এসে জমছে তাদের ইঞ্জিন কবে বন্ধ হয়ে গেছে—একটানা হাঁপাতে হাঁপাতে যার যতটুকু তেল ছিলো পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ—ময়লা-নোংরা-রংচটা বাস, প্রাইভেট ভাঙাচোরা লরি, হেলে পড়া টেম্পো, ডবলডেকার এখন সব খালি, ফাঁকা। ড্রাইভার সওয়ারী সব কখন নেমে গেছে,—তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় ফুটপাতে বসে পড়েছে, শুয়ে পড়েছে—গাড়ীর লাইন ধরে ধরে এগোলে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ডালহৌসী, ওদিকে বৌবাজার হয়ে শিয়ালদা, কলেজ ষ্ট্রীট সর্বত্র রাস্তা জুড়ে এলোপাতাড়ী উঁচুনীচু অজস্র গাড়ীর সেই মৌন শবযাত্রা,—চৌরঙ্গীর সেই বিশাল চওড়া রাস্তা এখন দলাপাকানো থিকথিকে একগাদা কেন্নোর মত গাড়ীর মিউজিয়ম বুকে করে নিঃস্পন্দ—আমি যেন বিশাল কোন এক টাটা সেন্টারের মাথা থেকে চারিদিকে তাকিয়ে সমস্ত কলকাতাকে আমার চোখের নাগালে ধরে ফেলেছি—স্পষ্ট দেখছি বড় রাস্তার চাপচাপ গাড়ীর ব্যারিকেড গলিগুলো থেকে কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না—সরু সরু সেইসব লেন, বাইলেন গাড়ীতে গাড়ীতে টইটুম্বুর বাড়ীতে বাড়ীতে গ্যারেজের গাড়ী একটু মুখ বার করেই থমকে গেছে চৌরঙ্গী ধরে টানা চলে গেছে সেই সব স্থবির মিছিল দক্ষিণে ভবানীপুর হয়ে হাজরা, রাসবিহারী টালিগঞ্জ, এদিকে সার্কুলার রোড ধরে ল্যান্সডাউন, গুরুসদয়, পার্ক ষ্ট্রীট, পার্ক সার্কাস যে দিকে তাকাও শুধু থরে থরে গাড়ীর স্থিরীকৃত বন্যার চিত্র। গাড়ীর মানুষ নেমে মাটিতে পা রাখার জায়গা পায়নি তাই ছাদের ওপর বসেছে সব একটু বাতাসের

ঈশ্বরের নামে এ প্রার্থনা আমি আকাশে মুখ তুলে করতে গেলাম—আর তখনই চোখে পড়লো।

একটা চকচকে পেল্লায় বিজ্ঞাপন হাওয়ায় উড়তে উড়তে ওপরে আকাশে অনেক ওপরে ক্রমশঃ উধাও—আমি তখনও পড়তে পারছি।

Let Calcutta be the pride of Heaven someday.

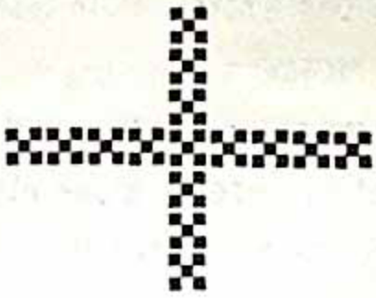

"মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতে হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়া থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চ-শিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজী ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?"

(রবীন্দ্রনাথ)

এক সময় থেকে লিখছে, তবু পারছে না। ভালো লেখে অর্ঘ্য বিদ্রোহী কবি তার আধুনিক কবিতা অথচ একটা যন্ত্রনামুখর জীবনের ছবি। ওরই মাসতুতো ভাই কৃপাময় সেন। তিনি লেখক, বড় লেখক। ওর সমবয়সী ঔপন্যাসিক। অশনির সম্পাদক ওর বাবার বন্ধু কাকাবাবুর পত্রিকা অতএব হবেই তো।

দু'একটা লেখা অবশ্য ভালো লেগেছিল আর সব ওই sex নয় আড়াই শো বছর আগের দক্ষিন আমেরিকার কোন আদিবাসীদের মধ্যে নারীর প্রভাব পুরুষদের নিয়ে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি। অবশ্য কৃপাময় সেন দাঁড়িয়েও যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে অরিজিৎ কলেজ ষ্ট্রীটের একটা বইএর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। খেয়াল পড়তেই চোখ গেল একটা শোকেসের সাজানো বইএর মধ্যে। কত উপন্যাস তাকিয়ে থাকে একটা উপন্যাসের প্রচ্ছদপটে ঠোঁটে একটা বিস্ময়ের হাসি। বারবার উপন্যাসটার নাম পড়ে 'ভোরের ওই সূর্য আলো'। প্রচ্ছদের ঠিক তলার দিকে বড় বড় অক্ষরে লেখা দিবানাথ, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক দিবানাথ। দিবানাথকে সে চেনে জানে। প্রচ্ছদের রঙীন ছবি হাজারে। মানুষ, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র। কত পোষাকের বাহার, রঙিন চশমায় কিছু রঙিন বাঁচার তাগিদে কিছু উন্মত্ত দারিদ্রের নাগপাশে আর কিছু জর্জর বুভুক্ষ তাদের ছবি এ শহর সমুদ্রে যেন তারা ভাসছে, উত্তাল স্রোত। অজানা ঠিকানার কূলে আদৌ টানছে কেবল টানছে। যেন চতুর্দিকে রব উঠেছে বাঁচাও। তারা ডুবতে চলেছে কোন এক পাতাল পুরীতে সেখানে আজ তারা অযাচিত নিমন্ত্রিত। অথচ ঠিক তিন হাত উপরেই ঝুলছে স্বর্গের সিঁড়ি তাদের ধরতে দেওয়া হচ্ছে না ধরতে পারছে না। আশে পাশে শুধু বিষাক্ত ঘায়ের পোকা ঘুনো পোকা, সমস্ত দেশটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কিন্তু সব কিছুর উপর দিয়ে ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে। এ প্রচ্ছদ যেন সমাজকে নিয়ে কথা বলছে এই লেখকরা অরিজিতের কাছে সম্মানের শ্রদ্ধার প্রতি মূর্তি। ওর বিস্ময় ওদের নিয়েই সাহিত্যিকের সান্নিধ্য সে পেতে চায়। দিবানাথবাবুর চেহারাটা এই মুহূর্তে একটু সময়ের জন্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, লম্বা, চওড়া সৌম্য স্বাস্থ্য। পরণে ধুতি গেরুয়া পাঞ্জাবী, প্রশস্ত ললাট ধবধবে গায়ের রঙ চোখে সেলুলয়েডের চশমা। গম্ভীর অথচ অমায়িক সামাজিক অথচ আত্ম-নির্ভরশীল। সাহিত্যিক সত্য সন্ধানী সাহিত্যিক। কেন অরিজিৎ কি একদিন সাহিত্যিক দিবানয়ের মত হয়ে উঠতে পারবে না? কোনদিন না? অনেক অনেক লিখেও না? এই চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তোলে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি অরিজিতের মধ্যে খেলে যায়। অরিজিৎ ভুলে যায় স্থান কাল মুহূর্ত।

সে যে ভবিষ্যতকে দেখতে পেয়েছে দেখতে পেয়েছে তার আদর্শ, নিষ্ঠা সব, এই কয়েক বছরের মধ্যে সমাজটা বিকিয়ে গেছে। বুঝতে পারল দুটো দিনের মধ্যে হাজারো তফাৎ— । পড়ে থাকা সবুজ মাঠটুকুতে ভরে গেছে ইঁট কাঠ চুন বালির প্রশস্ত ইমারত। সেদিন হয়তো প্রকৃতির খোঁজে

তোমার সাহিত্য। সত্যর জিওগ্র্যাফি নেই। নিষ্ঠার ভেতর সাহিত্য সাধনা কর। কৃপাময়দের দিকে ফিরেও তাকিও না ; ওদের কথা ভেবে তোমার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিও না। সাহিত্যের সাধনার কাছে কোন পুরস্কার বড় কথা নয়। একদিন বুঝবে তোমার এই সাহিত্য, তোমার সৃষ্টি সমাজকে কতটা উপকার করতে পেরেছে।

অরিজিত চমকে ওঠে, কে, তুমি কে কথা বলছ ?

আমি আর এক অরিজিত কথা বলছি।

—তুমি আমায় শুধুই কি আশার আলো দেখাচ্ছ ?

—না, শুধু আশা নয়, সংস্কৃতির প্রতি কর্তব্যের কথা বলছি। নিজের কর্তব্যটুকু করে যাও, ফল আপনা আপনিই পাবে। তার মধ্যেই পাবে পরম তৃপ্তি।

অরিজিত আর কোন কথা বলতে পারে না। মৃদু হেসে শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করে। এই মুহূর্তে তার মানসীর ঢলঢলে মুখটার দিকে তাকিয়ে ত'র বলতে ইচ্ছে করে, একদিন আমি লেখক হব মানসী, তোমার সৌন্দর্যকে আমি নোতুন করে তুলে ধরব। তোমার অপরূপ রূপ সে রূপের উখালি পাথালি স্রোতে কৃপাময় সেন্‌রা তোমার কাছে মাথা নীচু করে পালাবে। মানসী তোমার ঘোমটা ছাওয়া মুখটুকু চাঁদিনী রাতের আলো মাখা প্রেয়সীর মত। তুমি জানবে, তুমি নোতুন করে বাঁচবে।

—দাদা বইটা কিনবেন ?

অরিজিত চমকে ওঠে, পাশ থেকে বিক্রেতার কটাক্ষ প্রশ্ন। অরিজিত ম্লান হেসে বলল, পারলাম না।

—তাহলে সোকেশটার সামনে থেকে সরে দাঁড়ান।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

—বলুন ?

—বইটার সেল্ কেমন ?

—ভালো না। বড্ড আদর্শ টাদর্শ, তত্ত্ব কথা—ওসব চলে না।

—অরিজিত দাঁড়ায় না। নিজের মনে বলে চলে, কে বলেছে চলে না. এই বই আজো দাম পায় ; আজো রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়, পাঠকএর সমাদর করে কিন্তু কৃপাময়দের সমাজএর দাম দেয় না।

সবুজের প্রকৃতি এক মুহূর্তে বড় হয়ে যায়, দূরের আকাশটা ইঁট কাঠের সীমা ছাড়িয়ে, প্রশস্ত ইমারতের মধ্যে দিয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। অরিজিত কল্প জগতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়. প্রাণ ভরে হাসতে চায়।

সন্ধে ঘনিয়ে আসে, রাস্তার আলোগুলো জ্বলে ওঠে ; কাদের বাড়ীতে বোধ হয় সন্ধ্যের শাঁখ বাজে। মানসী ওর পথে থমকে দাঁড়ায় তার চোখে জল, কিন্তু মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। অরিজিত মানসীর চোখের জল মুছে দেয়—।

indivisible, i.e. atoms are bits or units of matter. These atoms, according to Democritus, are qualitatively alike but they differ in size, shape and motion. That is to say that they differ quantitatively.

We perceive physical objects through their qualities. It is commonly held that qualities are really inherent in material objects and cannot be separated from them. But the view is not free from difficulties. A piece of paper which is white to me is yellow to a jaundiced eye; the rose that appears red to me, is gray to a colour blind. It is, therefore, quite resonable to conclude that the colour of an object depends, at least to an extent, on the perceiver, and it is not an intrinsic property of the object. Now, if the yellow colour (in case of the jaundiced eye) is not in the paper, then where does it come from ? It is presumably not an illusion or hallucination. It must then be in the mind of the perceiver, i.e. it is a mental product. With numerous examples one can show that all qualities are dependent on the perceiving subject. These considerations lead some philosophers to believe that the world is a mental creation (either my mind or your mind or some Absolute Mind) ; it has no extra-mental existence We have created our world and live within it. The consistency and order among physical objects is supposed to be due to similar subjective conditions. This view of the world is called Idealism and according to this doctrine, there is nothing like 'matter' as an extra-mental reality ; mind, opposed to matter, alone exists Physical objects are explained as the ideas of some mind or other.

But we cannot be satisfied with this world view Philosopher, Dr. Moore thinks that objects are independent of us and knowing of them is a subjective mental fact inside the head. To know is to know something other than the very knowing process. The view that there are objects independent of our knowing of them is called Realism. Scientists hold this realistic world view and follow analytical method to understand the nature of matter.

Science in quest of matter : The scientific study of 'matter' in its modern form began with Newton, or perhaps with Galileo. Newton discovered some general truths regarding the behaviour of matter which he expressed in the form of certain laws of Physics. These are : laws of motion, the law of gravitation, etc. The atomic theory of matter was in vogue in ancient time. Different pictures of atoms are given by the modern

are called fundamental particles, The modern physicist have discovered some more fundamental particles, but they are not so important for our purpose so we leave them aside. Now the question before us is : how do these particles make different atoms ? The physicists take the same view as do the chemists to explain the diversity of physical objects, as explained before.

That is, different number of the fundamental particles and their organisation make atoms different Mercury, for instance, may be changed into gold only by changing its number of fundamental particles and their organisation equal to that of gold atom. Such transformation of mercury into gold was inconceivable in common-sense as well as in pre-modern science, but it is now quite possible. A more or less satisfactory atomic model was given by Bohr. His model is analagous to our planetary system As the planets round the sun, electrons revolve round the nucleus containing protons and neutrons In an atom, there are same number of electrons and protons, but same or different number of neutrons

In the second half of 18th century, almost all scientists were convinced that the motion of atoms and the beam of light could be reduced to Newton's mechanical laws. But Newton's laws failed to determine the velocity of light when passed through a medium. Those scientists were also unsuccessful to explain phenomena like interference, diffraction. polarization of light. So, light appeared to them as principally distinct from matter. Later on, Faraday introduced the concept of electro-magnetic field and Maxwell improved upon Faraday and showed that light is nothing but electromagnetic waves. It is purely energy and travels in vacuum with the speed of 3×10^{10}cm / sec. X-rays gamma rays, radio waves etc. are all such waves but they differ from light or each other only in their respective wavelengths.

In 1924, Louis de Broglie thought that elementary particles like electrons proton etc., even atoms, molecules or any ordinary object, might exhibit wave like properties under suitable conditions. Experiments on diffraction refraction, polarization of fast moving electrons etc. proved the wave character of material particles. According to Broglie, a wave is always associated with the particles of momentum mv, given by : $y = \frac{h}{mv}$

numerous examples of such conversion, e g. atom bombs involve transformation of nuclear mass into energy following the above equation. The mass-defect in isotopes is due either to the transformation of nuclear mass into energy or vice-versa. Again examples for transformation of energy into mass may be given as follows : cosmic rays shower, or gamma rays produce pairs of electron and positron. Positron is a fundamental particle and may be called positive electron Thus mass and energy together is an invariant. An example may be suitable for better understanding Suppose, I have a ten rupee note. I can, then, change it into various ways, say, a five rupee note and coins of five rupees ; or, one five rupee note, one two rupee note and a few coins ; and so on In whatever way I change the note, the total value of money remains constant. Mass and energy are like note and coin. Therefore, 'matter' is not as simple as we had conceived before It has a dual aspect. It is neither matter alone, nor energy alone, but both at a time. Let us try to understood the dual nature of matter. It is seen that an object may be conceived as a sum of the stored internal energy and external mechanical energy. As the stored internal energy remains constant in our common practice, we may say, it appears to be the mass of the body, or simply appears as matter (more or less its original sense). In the light of the theory of relativity, matter is no more distinct from energy. Matter is mere appearance of energy. Or, from the opposite point of view, matter alone exists, there is no distinct principle regarding matter which is unique ; and energy is only a function or manifestation of matter itself.

From our previous discussion, it is clear that the question : What is matter ? Or, what is its nature ? —cannot be answered so easily as it seemed to be. The concept of matter has undergone revision on several occasions. There has been much advancement in science in the recent past, but the exact nature of matter has not been known yet. At present the dual nature of matter has a claim over other conceptions of matter Further researches may prove that matter is something other than the alieged particles and energy ; these particles and energy may turn out to be mere functions of something more basic. Perhaps the ultimate stuff, call it matter or anything else, manifests itself through the alleged particles and energy. Possibly the stuff will ever remain a matter of conjecture and imagination The more we know about the universe the more we know that our know-

তুমিই আসামী

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ, অনার্স—ইংরাজী

প্রশান্তির জাল বুনে
তোমার অপেক্ষায় ছিল একজন,
সিক্ত যূথীর বনে,
বিভাস ভৈরবী, ঠুংরীর প্রচ্ছন্ন আলাপচারিতে ;
উষ্ণ চঞ্চু নিয়ে
চাতক যেমন ঘুরে মরে
সমস্ত আকাশের দিকচক্রবালে,
ঠিক সেই মতো কল্পিত বাসর-ঘরে
যে সুকুমার ললিত কলার বিন্যস্ত ছন্দে
আবেশ রেখেছিলে
তৃষ্ণার্ত চকোরের বুকে,—
আজ খুন হয়ে গেছে তারা
(তোমার) ভিন্ন হৃদয়ের সামীপ্য সন্ধানে
রয়ে গেছে কিছু ঝরাপাতা
নটিনীর ছদ্মবেশে.
স্মৃতির রোমন্থন গাথা,
আবেগ সংকুল কালের ঐশ্বর্যে ... —
দায়ী তুমি
সেই ক্ষণিক মুহূর্ত্তের জন্য।
ভাবী কালের
অন্তিম গহ্বরে
যেখানে শব্দের ধ্বনি বাজে.
জীবনের শেষ নির্ঘন্ট
ললাট টিকা এঁকে দেয় ;
তাদেরও জবানবাদী,
তুমিই আসামী ॥

মাটির আঘ্রাত বুকে শুতে
সেখানে তোমার চোখ ছুঁয়ে
বয়ে যাক পুরানো নদীরা
অঘ্রাণের শেষ হাওয়া তোমার অস্তিত্ব থেকে
ফিরে যাক দূরের লণ্ঠনে
বারবার চেয়েছিলে পৃথিবীর গোপন দ্বীপের
বুকের গভীরে ফিরে যেতে
যার খোঁজ আজকেও মানুষ জানেনি
আজকেও যে দ্বীপেরা জলের তলায় ভেসে আছে
তার খোঁজ চেয়েছিলে তুমি –

চেয়েছিলে সেইখানে তোমার প্রেয়সী ফিরে যাক
তার চোখে তোমার পৃথিবী
অবিচল হ'য়ে পড়ে থাক — ....
বারবার চেয়েছিলে
সেই দ্বীপে ঘাসের ঘ্রাণেতে
তোমার প্রিয়ার পাশে শুতে।

— • —

যখনি স্বপ্ন বুকে জড়াতে চায়
তখনো স্বপ্ন বুকের দূরেই থাকে
হতাশা আশার শিকড় ওঠাতে চায়
তুচ্ছ আশার কুঁড়ি কাছেই ফোটে।
কিজানি তোমার চোখের পল্লবেতে
কিভাবে আবার কবে ফুল ফোটাবো
নির্জনে স্বপ্ন-নদীর ঘাটের পথে
কিভাবে আবার তোমায় পাশে পাবো?
বহুদিন হারিয়ে যাওয়া শিউলিতলায়
ছায়াঘেরা শব্দ নিয়ে শিউলি ঝরে
বেহিসাবী রঙ হারানো হলদে পাতায়
অবহেলে মনের উঠান ব্যাপ্ত করে।
এখনো স্বপ্ন বুকের দূরেই থাকে
তবুও আশার কুঁড়ি কাছেই ফোটে॥

রাজনীতির মঞ্চ আর কুঁড়ে ঘর

শ্রীরুদ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়
বি,এ, ১ম বর্ষ—ভূগোল বিভাগ

রাজনীতি অর্থাৎ রাজার নীতি অথবা নীতির রাজা। আজ ভারতের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব। গ্রাম, গঞ্জে, শহরে, গলিতে শুনি রাজনীতি। আগে নাকি কেবল রাজা-উজিররাই শুনতাম রাজনীতি করতেন। আর আজ শুনছি নাকি সবাই রাজনীতি করেন। তবে আমাদের দেশে গরিব চাষী-শ্রমিক সম্প্রদায় দুবেলা দুমুঠো মোটা ভাত আর মোটা কাপড় পেলেই কিন্তু অতি সন্তুষ্ট হন। অধিক কিছু তারা চান না। কিন্তু তাদের সেই আশা চাওয়াকে কি আমরা রূপ দিতে পেরেছি? বণিক সম্রাট ইংরেজরা দেশ ছেড়েছে, শাসনভার হস্তগত হয়েছে স্বদেশী নেতা ও প্রভুদের হাতে। কিন্তু ইংরাজ আমলে যে চাষী শ্রমিক সম্প্রদায় খিদেয় ধুঁকত আজ কি তারা কিছু পেয়েছে? তখন চালে যাদের খড় ছিল না, হাঁটুর উপরে ছিল যাদের শতছিন্ন মলিন বসন, তাদের কি অবস্থার উন্নতি হয়েছে? যাদের মাথায় জুটতো না তেল তাদের কি এই তিরিশ বছর পরও মাথার চুলে জুটছে তেল?

দেশ জননী আজ শৃঙ্খল মুক্তা। মাতার পায়ে পড়েছে সহস্র বিন্দু সন্তানের রক্ত। কিন্তু সন্তানের হতাশা, সন্তানের নিদারুন দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য, এটার কি কোন সুরাহা করলেন না মাতা (দেশমাতা)! সেই ক্ষিধে, সেই রোগ, শোক এখনও নিত্যসঙ্গী হয়ে রইল এই শূদ্র সম্প্রদায়দের সাথে। পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন হয়েছে সত্য, তা কেবল শাসক গোষ্ঠীর। বিদেশীর স্থলে স্বদেশী ঠাঁই পেয়েছে মসনদে।

গণতন্ত্রের পবিত্র শত স্বরূপ ভোট' দিয়া তো তারা বসাচ্ছে নতুন প্রভুদের। কিন্তু দুঃখের কতটুকু লাঘব হল? জানি না, বর্ষায় সেই আগের মত ঘরের ছিন্ন চাল দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে কচি ছেলে মেয়ের চোখে সেই আগের মত কান্নার স্রোত এর কি কেউ গতি রোধ করতে পারল? উত্তর নেই।

আমরা সাম্য, সাম্য বলে চিৎকার করি, কিন্তু যখনই তাকাই ওদের দিকে দেখি, সেই tradition রূপ অবস্থা আচ্ছাদন বিহীন কুঁড়ে ঘর, মলিন শতছিন্ন পোষাক, কংকালে সার দেহ আর বুকভরা বোবা কান্না। এটা অবশ্য ঠিকমত অনুভব করতে পারি না। পারলে তো সমস্ত কিছু না হোক কিছু অন্তত সমস্যা মিটত। কিন্তু আনন্দের পাশেই দেখি বিরাট অট্টালিকা, গাড়ী, চাকর ঝি আর অহেতুক আড়ম্বর। ক্ষিধেয় যখন একদল কান্না চাপতে চেষ্টা করছে পাশেই অন্যদল তখন

আসুন না আমরা সবাই মিলে রাজনীতির মঞ্চ থেকে নেমে গণনীতি করি, গরীবের সঙ্গে পথ হাঁটি ওদের ঘরে তুলি আলোয় দাঁড় করাই, নাই বা রইল তাতে রাজনীতি, নীতির রাজা সাম্য নীতিতে আমরা তখন চেনা অচেনার বেড়া ভেঙ্গে একটাই রাস্তা বানাতে পারব, আর সেটাই হবে পথের রাজা রাজপথ।

যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে, সেই কর্ম সৎকর্ম। কিন্তু তারা জানে এ কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস।

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

এই নিরক্ষরতার বিরাট অংশ, যাদের বয়স ত্রিশএর উপর তাহারা লজ্জায় হয়ত নৈশ বিদ্যালয়ে আসে না। কিন্তু ছাত্রসমাজ তাহাদের বাড়ীতে গিয়ে বোঝাবে, তাহাদের লেখাপড়া শেখার গুরুত্ব আলোচনা করবে। তবেই ত অশিক্ষিত সমাজ অবলেহিত সমাজ—শিক্ষার আলো পাবে।

আমাদের সরকার এই বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হচ্ছেন কমার্স ছাত্র সমাজের আর একটি সমাস্য হল আর্থিক। যদি নিজেদের গ্রামের বিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় ছাত্ররা নৈশ বিদ্যালয় খোলে এবং তাহাতে যদি সরকার কিছু আর্থিক সাহায্য সঞ্চয় করেন—তাহলে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। উভয়ের আগ্রহে কাজটা বেশী হবে, অন্যদিকে বয়সপ্রাপ্ত অশিক্ষিত সমাজকে সচেষ্ট হতে হবে। এই সরকার তাহাদিগকে যদি কিছু আর্থিক সাহায্য দেন তাহলে তারাও অগ্রণ হবে।

তাই উপসংহারে এই কথাই বলা যেতে পারে নিরক্ষরতা দূরীকরনে ছাত্র সমাজের দান যথেষ্ট আছে। যদি নিষ্ঠাবান ছাত্রসমাজ তাহাদের এই কাজ পরম পবিত্র দায়িত্ব বলে মেনে নিয়ে কাজ করে তাহলে অবহেলিত, অশিক্ষিত মানুষ জ্ঞান কর্ম ও বাঁচবার আলো দেখতে পাবে।

"যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়াও পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ, দরিদ্র হইয়াও ধনগর্ব্ব ও কুকার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, সেই মূঢ়।"

may differ as to the notion of 'experience'. That is to say, the generic character of the objects that one might experience in course of one's enquiry, is presupposed by the dicipline concerned. And, there is no a priori guarantee that different disciplines will mutually agree in this respect And, for a more efficient dialogue between disctplines their respective presupposition (in respect of 'experience' as well as in other resects), which are likely to be reflected in their conceptual apparatus, are to be clearly set forth Radical difference in this regard between any two systems of study, as it is presumably the case between Classical Physics and Quantum Mechanics, or between Marxism and Advaita, Vedanta, may cause communication gap between them

Points of View: Every discipline adops a point of view. One of the ways in which we may distinguish one discipline from another is to refer to their distinctive points of view The point of view refers to the set of conditions under which the 'object' is studied Now, the set of general conditions to which the disciplines conform may be included within what we have called presupposition' But the special restriction imposed on particular disciplines i e the special conditions under which the studies are conducted, represent the point of view. Socrates to take a concrete case, is a hard object and may be subject to different kinds of investigation He may be studied sociologically in respect of his 'demoralising' the youth; he may be studied psychologically in respect of his relation with his wife; he may be studied physiologically in respect of his body—build; and so forth. The general character – or the form, in Wittgenstein's (Tractatus) language–which Socrates has as an object, makes it possible that Socrotes is wise or that he fears his wife, or that he has a delicate health A particular science selects a set of conditions, and studiesthe object accordingly. To give further examples: the group-behaviour of men may be studied under specific conditions of a system of production, under conditions of a religious predicament, or under conditions of organised propaganda These conditions form the view-points of the disciplines concerned.

Differences in view-points between any two disciplines will be reflected in their categorical frame-work. In some cases, such differences might be traced back to the presuppositons of the disciplines. When

these and the agricultural projects, or other requirements of the eountry. Each project may have its own objective, but if the purposes of the different projects do not converge to a common point, as it had been the case with us, we tend to degenerate into a disorganised crowd rather than emerge as a single nation.

(III)

5. I do not intend to draw a bleak picture of the community we belong to. My intention is to draw our attention to certain factors that need careful study, so that we may make a bleak picture bright. I would like to point out that inter-disciplinary discourse, so very badly needed now, may be made more meaningful if we pay due attention to these factors. I would like to suggest that the possibility of adopting a common set of presupposition and of pursuing a common (or mutually converging) objective may be thoroughly examined. To the extent that this can be achieved the disciplines may open fruitful dialogue among them. The difference between the disciplines, then, would be reduced to their points of view only. This might go a long way towards a more comprehensive understanding of the nature of things and a more efficacious programme for building up of a community—regional or international.

নির্জন চুল দুটি যেন সবচেয়ে বেশী ক্ষুধার্ত এই পৃথিবীতে বাঁচবার মোহকে যেন আরও বেশী করে জেনেছে। সেদিকে তাকিয়ে জুলি ভাবলেন, বোধ হয় সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের পরই হেনরির মধ্যে এই পরিবর্তন হয়েছে।

জুলি তখনও নিষ্পলক নয়নে বিস্ময়ে তার দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে তাঁর জল এসে গেল। ওঁর মনে হল তার ও দিদির জীবনে কোন এক ভয়াবহ দুঃখের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। তখন তিনি হেনরিকে বললেন,—আচ্ছা দিদি তোর কী হয়েছে বল্ তো?

সামান্য একটু হেসে বেদনার্ত গলায় হেনরি বললেন—না! নারে কোন্ কিছুই আমার হয়নি। তুই বোধ হয় আমার ঐ সাদা চুল দুটি দেখে ভয় পাচ্ছিস। কিন্তু জুলি ধরা গলায় বললেন—উঁহুঁ ও কথা বললে আমি শুনছি না। বল্ না দিদি সত্যি তোর কী হয়েছে? আর যদি আমায় লুকোস তাহলে দিব্যি দিচ্ছি দেখ তোর সঙ্গে আমার আড়ি, আড়ি, আড়ি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটল। এরপর কিছুটা বিনীত ও কোমল কণ্ঠে হেনরিয়েতা বললেন - আমি একজনকে ভালবেসে ফেলেছিরে।

ততক্ষণে হেনরির চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করেছে। জুলির কাঁধের উপর হেনরি মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। যখন তিনি নিজেকে অনেকটা সামলে নিতে সক্ষম হলেন, সব কথা খুলে বললেন একে একে জুলির কাছে।

দুটি বোন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। জুলি হেনরিয়েতা গলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে দিদিকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন।

হেনরিয়েতা বলছিলেন,—আমি কী করে বলিরে বোন। একজনের কাছে আমার এ কৃতকর্মের কোন ক্ষমা নেই। এক একসময় মনে হয়, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। আসলে কী জানিস, আমি এখনও নিজেকে নিজে চিনি না। যদি তুই জানতিস, আমরা স্বামী স্ত্রীতে কীরকম পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি অথচ জীবনের এই মধুর সময়টা যেখানে বিষণ্ণতা মানুষের মনের সুখকে দেখে হিংসায় দূর দিয়ে হেঁটে চলে যায়, যেখানে সেও মনে করে ভগবান আমায় এ জগতে সুখী করলেন না কেন; যে সময়টাতে ফাল্গুনী কোকিলের ডাকে রাঙা হয়ে বিরহীনারীর হৃদয়ে জাগায় পুলকের মৃদুল হিল্লোল; জীবনের সেই সবচেয়ে ঈপ্সিত সময়ের ভ্রূণহত্যা করেছি আমরা দুজনে মিলে।

- তুই তো আমার স্বামীকে জানিস, কী প্রকৃতির লোক তিনি; এবং এটাও তো দেখেছিস যে আমাকে কী রকম ভালবাসেন তিনি। কিন্তু কখন সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয় জানিস, যখন দেখি যে তিনি এতখানি হৃদয়বান ও স্পর্শকাতর হয়েও একটি নারী হৃদয়ের সবটুকু বুঝতে পারলেন না।

—তিনি সর্বদাই হাসিমুখে থাকেন, তাঁর সদা প্রফুল্ল মুখ যেন তাঁকে একটি সম্পূর্ণ মানুষ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যদি তিনি আমাকে আমার তপ্ত মরু-হৃদয়কে তাঁর

সুন্দর স্বচ্ছতা, তা আমার হৃদয়কে করেছিল অনির্বচনীয় ভাষায় মুখর। শব্দের আকাশে কণা কণা নীরবতার যে ভাবময় অনির্বচনীয়তা তার আবেগে আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়েছিলাম। আহা কী গভীর তার আবেগের পূর্ণতা।

—আমি ঘাসের উপর বসেছিলাম, আমার চোখের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিলাম সেই হ্রদের উপর সেই বিজন বিষণ্ণতাও কেমন এক মোহজাল বিস্তার করেছিল আমার অন্তরে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এল আমার মধ্যে। আমার হৃদয় প্রেমের অতৃপ্ত কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। জীবনের এই নির্বোধ ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি ভাঁড়ের মত, যে অন্যকে হাসায়, কিন্তু যে হাসির পেছনে তার হৃদয়ের কান্না লুকিয়ে আছে তাকে দর্শকেরা দেখে না—এই ভেবে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কী ভাবে আমি বেঁচে আছি! আমার সমগ্র জীবনের ভাগ্য একটি লোকের হাতের মুঠোয় এভাবে ধরা পড়ে আছে যাকে আমি আমার সমস্ত কিছু দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলাম। এই রকম একটি চন্দ্রালোকিত রাতে।

—এবং তোকে কী বলব জুলি দুঃখে জল বেরিয়ে এল আমার চোখ দিয়ে. আমি সেই নির্জন হ্রদের ধারে বসে কাঁদতে লাগলাম। সেই সময়েই শুনতে পেলাম কে যেন আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। একটী লোক বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করছিল। যখন আমি পেছনে ঘুরে বসলাম সে আমাকে বলল—'আপনি কাঁদছেন! —কেন?

—সে ছিল একটী তরুণ বারিষ্টার। সে তার মাকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিল এবং ওর সাথে আমাদের কিছুদিন আগে আলাপ হয়েছিল। আমি ওকে দেখে এত বিস্মিত হয়েছিলাম যে ওর কথার কী উত্তর দেব আমি ভেবে পেলাম না। শুধু তাকে বললাম- আমি অসুস্থ বোধ করছি।

সে তখন আমার সাথে আমার পাশে পাশে হেঁটে চলল। এবং আমার সঙ্গে এই ভ্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করল। যা কিছু আমি অনুভব করেছিলাম, যা কিছু আমাকে বিমূর্ত করেছিল সেই রাতে তার সবকিছু সে তার আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করল। অমন কি আমার নিজের হৃদয়ের বেদনা ও যেন তার কণ্ঠে অপূর্ব বাণীমূর্ত্তি পেল। সে আলফ্রেড দ্য ম্যুসের কবিতা আবৃত্তি করে চলল তার উদাত্ত কণ্ঠে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। আমার হৃদয় আবেগের তাড়নায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল আমার মনে হল তুষার কণায় ঢাকা সমস্ত পাহাড়টা এই হ্রদ, সর্বোপরি এই চাঁদনী রাত সবকিছু যেন একটা অনির্বচণীয় সংগীতের সুরধারায় সিক্ত হয়ে গেল—সমস্ত জগতকে মনে হল বিধাতার তৈরী একটা বিরাট মায়া। —আমি তারপর আর তাকে দেখিনি। শেষ দেখেছিলাম পরের দিন সকালে যখন সে বিদায় জানিয়ে চলে গেল সে আমাকে তার কার্ডখানা দিয়ে গেল যাওয়ার আগে।

এই পর্যন্ত বলে হেনরিয়েতা জুলির দিকে উদাসভাবে তাকালেন। তার কণ্ঠের স্বর তীব্রভাবে

কাটিয়া হাটের ইস্‌মাইলের ভ্যানরিকসা

গোবিন্দ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সান্ধ্যানিক (সংস্কৃত) : ৩য় বর্ষ

প্রকৃতির ফুল ফুটিয়া সেখানে
করেছে জগৎ আলো
মনের মাঝারে বসায়েছি তাকে
তাকেই বেসেছি ভালো।

বসিরহাটের খেয়া পার হয়ে সোজা সংগ্রামপুরের ঘাটে গিয়ে উঠলাম আমি ও আরো অনেকে যাদের পরিচয় আমার জ না নেই। আমি নৌকোর উপর কলকাতার বাবুদের মতো কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর আশে পাশের যাত্রীরা ঘন ঘন আমায় দেখছিলো। সে যাই হোক, খেয়া থেকে নেমে জোর পায়ে বাসের জন্যে হাঁটলাম। অদূরেই বাস দাঁড়িয়েছিলো আমাদের জন্যে। বাসে গিয়ে উঠলাম এবং একটা জায়গা দখল করে বসলাম। বাস ছাড়তে দেরী আছে দেখে আমি নেমে এসে পাশের দোকান থেকে এক কাপ চা ও একটা কেক চল্লিশ পয়সা দিয়ে খেয়ে আবার আমার পূর্বের জায়গায় গিয়ে বসলাম বাস ছাড়লো সকাল এগারোটা বেজে দশ মিনিটের সময়। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর বেশ জোরে জোরে চলতে লাগলো। ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে আমার সেই জায়গা। গাছের সবুজ শাখে শাখে আমের বোল (মুকুল) ফুটে তার সুবাস ছড়াচ্ছে চারদিকে। আমি ও সেই গন্ধ বাসের মধ্যে থেকেই পাচ্ছিলাম। এর মধ্যে তেঘরিয়া এসে গেছে। বুঝতে পারলাম এর পরই হলো কাটিয়া হাট সেখানে আমায় নামতে হবে। সময় মতো সেখানে নামতে আমার কোন রকম অসুবিধে হয়নি, তবে বাসে বেশ ভিড় ছিলো।

বাস থেকে নেমেই চারদিকটা একটু ভালো করে দেখে নিলাম। কি যে দেখলাম তা আমি নিজেই জানিনে। তবে চারদিকে আগের চাইতে যে অনেক উন্নতি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি এদিক ওদিক দেখছিলাম। হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়লো একটা তিন চাকার ভ্যানরিক্সার দিকে। ভ্যানচালক তিনজন লোক নিয়ে অপেক্ষা করছেন আরো একজনার জন্যে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি বসলাম, গাড়ি ছাড়লো, ভাড়া পঁচিশ পয়সা মাত্র। গ্রামের মানুষ এই যেন তাদের কাছে অনেক বেশী।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। আমরা মোট চারজন যাত্রী—দু'জন মহিলা আর আমরা

—ইস্‌মাইল।

নামটা খুব জোরের সঙ্গেই বল্লেন তিনি। আমি বুঝতে পাচ্ছি যে তাঁর এই গাড়ি টানতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তবুও টানছেন দু'টো পয়সার জন্যে। সবাই তো আর আমার মতো না যে দুটো টাকা হাতে পেলেই গ্রাম ঘুরতে বের হবে বা কি করে ওটা খরচা করা যাবে তার ব্যবস্থা করবে। কেউ চায় টাকা রোজগার করতে আবার কেউ চায় খরচ করতে। আর আমি হচ্ছি সেই খরচ করার দলে। যায় হোক, বেশ কিছুটা সময় চুপচাপ থেকে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে—" আপনি একসঙ্গে এই গাড়িতে কতো মাল টানতে পারেন?

—"তা বাবু আট ন মণ তো বটেই" উত্তর দেন ভ্যানচালক ইসমাইল।

শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বল্লাম "বয়েস তো আপনার অনেক হয়েছে। সুতরাং এই বয়সে অতো মাল টানতে পারেন?

—"কেন পারবানে না বাবু? বয়েস হয়েছে বালে কি চুপ করে থাকলি হবেনে? খাতি হবেনে না? এই প্যাটের জন্যই তো সব কত্তি তা না হলি কে কার জন্যি বসি থাকে বলুন"—বেশ একটু রাগো রাগো গলায় বলে উঠেন ইস্‌মাইল।

আমি তাঁর কথায় সাড়া না দিয়ে পাল্লাম না। কালো বেঁটে ছিপছিপে চেহারার লোকটাকে আমার খুব পছন্দ হলো। মাথার উপর এখনও পর্যন্ত বেশ চুল আছে, গালে দাঁত আছে, পরিষ্কার ভাবে কথা বলেন। গাড়ি চালাবার ফলে তাঁর পায়ের ম্যাসেল্‌স-এর শিরাগুলো বেশ ফুলে উঠেছে। হাত দুটো দেখে মনে হলো, যেন বেশ বলিষ্ঠ পরুষের মতো হাতগুলো। বয়স কম করেও ষাট্ তো বটেই।

এর মধ্যে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। পাশদিয়ে একখানা ভ্যান তীরবেগে বেরিয়ে গিয়ে আগে উঠলো। ভ্যানের চালক ছিলো একটা যুবা ছেলে। এগিয়ে গিয়ে সে বল্লে —চাচা, তুমি আমার সঙ্গি পাইলে না তো, আমি তোমাকে — । তার কথা শেষ হতে না হতেই ইস্‌মাইল চাচা বলে ওঠেন —'তা যা বাপ্, এক সময়ি আমরাও অমনটি ছালাম; আজ না হয় বুড়ো হয়িছি"। —"তুমি ওঠ দিনি"—যুবা চালক বল্লে। ইস্‌মাইল চাচা বল্লেন—"না বাপ্, অমন গায়ের জোর আর নেই।"

আমিও তাঁকে জোরে চালাতে বারণ কল্লাম। আমরা এগিয়ে চল্লাম আমাদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে. আবার একটু চুপ করে থাকি আমরা। তারপর আমি ইস্‌মাইল চাচাকে জিজ্ঞাসা করলাম —আচ্ছা দাদা, এই যে মেয়েরা সব যাচ্ছে, ওরা সব কোথায় যাচ্ছে? তিনি আমার প্রশ্ন শুনে বল্লেন— এঁরা বাবু; এরা ঐ আপনি যেখেনে নামবেন, সেখেনে নেমে আরো আদ্‌মাইল বাঁয়ের দিকে যাবেনে; ওখেনে পুজো দেবেন।

ইচ্ছেটা যেন আমার আরো বেড়েগেলো। জিজ্ঞাসা কল্লাম তাঁকে— ওখেনে কি ঠাকুর

রাত শেষ ঘুম পায়

সৌমিত্র ভট্টাচার্য
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ-কলা বিভাগ

শেষ প্রহরের ঘন্টা বাজে
রাত্রির বিদায় ঘোষণা।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুক্ খুক্ মিষ্টি কাশি
রাত শেষের পরোয়ানা।
পা টিপে টিপে ওরা চলেছে শহরের বাইরে
কোথাও কাজ আছে।
মণিদীপা লাইট জেলে বই পড়ছে
পাসের পড়া।
একটা মোটর হঠাৎ আওয়াজ করে জেগে উঠল
হাই তুলল
দীর্ঘশ্বাস ফেলল
বাসি মুখের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।
এবার অনিচ্ছসত্বেও তাকে হিঁচড়োতে হবে
মিঃ অমুক যাবেন বিদেশ
ট্রেন! টাইম টেবিল! হাওড়া ষ্টেশন!
মণিদীপা টেবিল আলোটা নিবিয়ে দিল
হাই তুলল
পাশের পড়া।
ভাঙ্গা টিউবওয়েল ওপাশে
আর্ত্তনাদ করে উঠল তীব্র প্রতিবাদে।
চৌকিদারের লাঠি ঠোকার শব্দ
শ্লথ ক্লান্ত এলোমেলো!
রাত শেষ দিন আরম্ভের সংকেত!
চৌকিদার বাড়ী ফিরবে।
মণিদীপা আড়মোড়া ভেঙ্গে বইয়ের পাতা ওলটালো
টুপ্‌ টাপ্‌! কলের জল!
ঝনাৎ ঝন! বাসন মাজা! বিরক্ত হাজা হাত
ছোট মেয়ের ক'কিয়ে কান্না
মণিদীপা বই গুছোলো! ঘুম একরাশ ঘুম!

হয়েছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি। তাদের দুঃখকষ্ট, তাদের প্রতি শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার সবই যেন ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই তাঁর লেখনীও জানিয়েছে তাদের প্রতি সমবেদনা।

তদানীন্তন জটিল সমাজব্যবস্থার আর্তে সুকান্ত দুঃখিত ও বিচলিত। তাই সাধারণ জীব, বস্তু প্রভৃতিকে মাধ্যম করে তিনি গরীবদের প্রতি জানিয়েছেন সহানুভূতি। আমরা এর প্রমাণ পাই তাঁর "একটি মোরগের কাহিনী"-র মধ্যে—

" তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড় ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে।"

অতি সামান্য ক্ষুদ্র জিনিষের মধ্যে দিয়েও বিদ্রোহী সুকান্ত তাঁর বিদ্রোহী মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই একটি দেশলাই কাঠি বহন করছে সমস্ত নিপীড়িত মানবশ্রেণীর কণ্ঠস্বর। দেশলাইএর মত বিদ্রোহ করে তারাও যেন শপথের সুরে বলে উঠলে—

" ... কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই—শেষবারের মত।"

সুকান্তের রচনায় ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের মত গভীর মমতা। একটা নির্দিষ্ট কর্তব্যের মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকা অনেক সাধারণ মানুষকে আমরা রোজকার জীবনে দেখি। কিন্তু কজন ভাবে তাদের সুখদুঃখের কথা। মুহূর্তের জন্য কর্তব্যের কঠোর বন্ধন থেকে এরা মুক্তি পায় না। কিন্তু এই দুঃখকষ্টের পরিবর্তে এরা কি পায়? পায় কি একটু সহানুভূতি, মর্ম বেদনা?

" ... পিঠেতে টাকার বোঝা তবু এই টাকাতে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রাণার ছোট,
দস্যুর ভয়, তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।"

কিন্তু optimist বা আশাবাদী কবি পরক্ষণেই বলছেন—

রাণার রাণার ভোর তো হয়েছে—
আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?"

নবান্নের কমল বাংলার কবিদের কবিতার একটি প্রধান উৎস। এই নবান্নের কমলের মধ্যে কবিরা দেখেছেন খুসীর আমেজ, আনন্দের জোয়ার। তাই তাদের রচনাও সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু

নিয়ে আশা রাখি, যে পথে তিনি বিচরণ করেছিলেন, সে পথ পুনরায় গুল্মবনে বেষ্টিত হলেও, ভবিষ্যতের কবি এসে সে পথে বিচরণ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য অধুনা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে তিনিই প্রথম ও শেষ পথিক। তবু আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে। ইতিহাস হয়ে সুকান্ত আশ্বাস রেখে গেছেন।

পরিশেষে কবি সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে।

"অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিমান
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবানসম—

তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম, করুণ, কোমল উক্তিটি বোধ হয় সুকান্তের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ধ্বংস হলে পরিবর্তন কিসে হবে? প্রাণের শরীরের পুরাতন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে হবে, প্রাণকে শরীরকে নয়।

—শ্রীঅরবিন্দ

অজ্ঞাত রমণীরে

শ্রীদিবেন্দু কুমার বারিক
বি, এ ১ম বর্ষ (সংস্কৃত অনার্স)

এখনো তোমার রমনীয় দেহে তীক্ষ্ণ নখে কে
উল্কি পরায়, লেখে পরিনামী গল্প কথা
দীপ্ত ললাটে আঁকে কুচক্রী কালের ছবি,
আহা অপরূপ সুন্দরী তোমার মরণ ভালো।
সেই কবি যার লক্ষশ্লোকেও পড়েনি ধরা
তোমার সুগভীর চোখের যোগ্য উপমা আজো,
শত চরণেও মুখের মহান শিল্পরুচি
বর্ণণা যার হয়নি সে তুমিই মায়াবিনী।
সেই ভাস্কর নিরলস মেতে পরিশ্রমে
যার ওষ্ঠের অদ্ভুত গুঢ় হাসির রেখা
ফোটাতে পারেনি বলে মৃত্যুর প্রবল প্রেমিক
তুমি যে মহান সুন্দর, তুমি মমতাময়ী,
অথচ এখনো কে যেন চোখের আড়ালে বসে
উল্কি পরায়, লেখে পরিনামী পরান কথা
দেহের উগ্র বাগানের ফুল দু হাতে দলে
অসহায় মানুষ, ততোধিক তুমি উপায় হীনা,
বৃথাই বস্ত্রে ঢাকো বুকের ললিত চূড়া
বৃথাই কবরী সাজো মোহন পুষ্প ভারে
গোপন প্রেমিক ঈঙ্গিতে ঢালে চিহ্ন জরার
মরন, এখন প্রেয়সী তোমার মরণ ভালো॥

দেওয়া যেন আমাদের পাশের বাড়ীর নদের নিমাই—কাব্যে ও সঙ্গীতে এ রীতির তুলনা বিশ্বসংস্কৃতির অন্য কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

ঘরে রাঙা টুকটুকে বউ এনেদিলেন মা। ছেলের মন লাগল না। লাগবে কেমন করে। পুঁথিপত্র ন্যায়শাস্ত্র পড়ে তিনি বুঝেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য। তাই শ্রীবাসাদি বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আচন্তাল মানুষকে জাতপাত ধুয়ে এসে মিলতে ডাকেন এক ছাতের তলায়। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকার পণ্ডিতরা সুনজরে দেখেন না এসব ঘটনা। শচী মা ভাবেন তাঁর নিমাই ঘরেও থাকুক পরেও থাকুক। তা আর হয় কই। বন বনান্ত সংসার সমুদ্র সীমান্তের কোন পরপার থেকে বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মন মাঝে। মাঝামাঝি জগতে থাকতে না চেয়ে পঁচিশ বছরের সুদর্শন ছেলেটি মাঝরাতে গৃহত্যাগী। রইল পড়ে মা, রইল পড়ে জোত জমা। নিমাই নিল সন্ন্যাস। এই জীবন নাট্য ধরা দিয়েছে গৌর-চন্দ্রিকার পদে। ধরা দিয়েছে গৌরাঙ্গের শ্রম সুন্দর মুখের নিটোল ছাঁদ ছবি। বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব কদম্ব। শব্দ সংগীত ময় গৌরচন্দ্রিকা কাব্য। কলকাতাতে যেদিন বর্ষা ছিল আর ছিল টাকী নিবাস তৈরীর আগে প্রশস্ত জমির ওপর কদমগাছ সেদিন ঐদটিকে আর তার ওপর আসন পিঁড়ি একটি ধ্যানকে আমি কতবার যে ফুটতে দেখেছি। বছর আটাশ আগে রাসবিহারীর এক সেলুনে চুল কাটতে কাটতে এক বাউলের গলায় পেয়েছিলাম গৌরচন্দ্রিকাকে। বাইরের রাস্তায় তখন ডাক দিয়েছে এক ভীড় রোদ। অফিস টাইমকে ছাপিয়ে ও গাইছিল একতারে। আছে যার অন্তরে পুত্রের ব্যথা তার জীয়ন মরণ সমান কথা আমি পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা। আমার ছেলেবেলার বন্ধু মালাকার বাড়ীর ছেলে মানিকতলার কানু গাইত 'কি করিলি বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই চান্দ বিদায় দিয়া'। সেভেন কি এইট ক্লাসে একটা কবিতা পড়েছিলাম। মনে আছে শচী মা ভোরবেলা উঠে দেখেন ঘর খালি দুয়ার খোলা, আর্ত্তস্বরে ডাকলেন নিমাই, নিমাই, প্রতিধ্বনি উত্তর দিল নাই নাই। কৃষ্ণের যেসব ছবি গান গল্প নিয়ে কবিতা হয়েছে তাতে ছেলেবেলা লুকোচুরি প্রেম আড়াল বিরহ সব আছে কিন্তু গৌরাঙ্গের মত মানবিক নয় সর্বত্র। গৌরাঙ্গ দেবের সহজ শাদা-মাঠা বাউলিয়া গল্পটি যদি কবিতায় না আসত তবে বৈষ্ণবপদ একটা পরিপূর্ণ আনন্দ ঘন মানুষের প্রিয় সঙ্গ পেত কিনা সন্দেহ। রাধামোহন যখন আঁকছেন চারটিমাত্র শব্দে ছল ছল নয়ন কমল সুবিলাস তখন ক্রন্দনময় একটি মানুষকে পাই। নরবলি চাবুক জাতছাড়া এক ঘরে অস্পৃশ্যতা অপমান ভিটে মাটি উচ্ছেদের লাঠি এসব সামাল দিতে ব্যাকুল নিমাই কাঁচা সোনার মত গায়ের রংকে জ্বালিয়ে খাক করে অশ্রুর শুক্তি বানালেন। কবিতা দীর্ঘজীবি। জ্ঞানদাস লিখছেন 'চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া'—ক্ষিতি তলে পড়ি সহচর মুখ চায়। আচার্য নন্দলালের চৈতন্য চিত্রে এই সব কবিতার লাইন রেখায়িত বলে আমার মনে হয়েছে। নরহরি সুদক্ষ চিত্রকরের মত শব্দ দিয়ে এঁকেছিলেন গৌরাঙ্গদেবক—। মোর গৌর

এই দৃশ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাসন্তিক দোলসঙ্গীত মিশিয়ে ফেলতে বড় একটা অসুবিধা হয় না—

"লাগিল দোল জলে স্থলে
লাগিল দোল মনে বনে"।

শ্রীগৌরাঙ্গ গীতি গৌরাঙ্গ ভাবনা বাংলা বা বাঙালীর প্রাণের সম্পদ—চন্দ্রও সুন্দর শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গদেবও সুন্দর, ছুয়ে মিলে—গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকা তত্ত্বময় ভান নয় ভক্তির উৎসার।

এক একটি ইজম এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলেই পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোন কোন দেশে ইজমের লড়াই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোন ইজমের বা মতবাদের দ্বারা মানব জাতীর উদ্ধার হইতে পারে না. যদি সর্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ করিতে না পারি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

যদি অবাধে রাজনীতি চলিতে থাকে তাহা হইলে শিক্ষা ক্ষেত্রের অবনতি যে কত সন্নিকটে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। আজ যে শিক্ষা জগতে এত অনাচার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজনীতির অশুভ প্রভাব, সেই অশুভ প্রভাব দূরীভূত না হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কী শিক্ষক, কী ছাত্র, কী কর্মী, প্রত্যেককেই রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত হইতে তফাতে থাকিতে হইবে, তবেই যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। এবং শিক্ষার যে কোন দায় দায়িত্ব শিক্ষাবিদদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে; সেক্ষেত্রে কোন রাজনীতিকদের কোন ভূমিকাই প্রাধান্য পাইবে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য লইয়া আসে পরীক্ষা, শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে যে পরীক্ষানীতি প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত না হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা : পরীক্ষা ব্যবস্থার দুইটি উদ্দেশ্য বর্তমান পরীক্ষার পরিমাপ মূলকও শিক্ষাগত যোগ্যতা, এই দুইটি বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে। পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত মানের পরিমাপ করিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষানীতির দ্বারা তাহা সম্ভব নহে, পরীক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাগত দিকটির উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিলে উপলব্ধি করা যাইবে, প্রচলিত পাঠক্রম কি পরিমাণ সার্থক হইয়াছে, এবং কতখানি সাফল্য আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

শিক্ষক-সমাজ : শিক্ষা ও পরীক্ষা, দুই-এর সাফল্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে শিক্ষক সমাজের সহিত আমার মতে, শিক্ষককের উপর অধিকতর আস্থা রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র করিয়া লইতে হইবে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রাক্কালে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে যে—তাহাদিগের সততার উপর যথোচিত নির্ভর করা হয় না। ইহা ছাড়া শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন। অর্ধভুক্ত, ক্লান্ত ও সামাজিক সম্মান-বঞ্চিত শিক্ষকের নিকট হইতে উপযুক্ত সক্রিয়তার দাবী নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক ও অবাস্তব; সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক সম্পর্কেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়, যাহাতে সেই সকল শিক্ষক ভবিষ্যতে সঠিক পথগামী হন। তাই একবাক্যে বলা যায় শিক্ষকদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে পরীক্ষা ব্যবস্থারও কোন উন্নতি সাধন হইবে না আর তাহাদিগের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অভাবে শিক্ষা জগতের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হইবে না।

ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য : অধ্যয়নরত ছাত্রদের কয়েকটি অতি অবশ্য পালনীয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক ছাত্রের মনে রাখা উচিত যে "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্", তাই তাহারা তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাশীল হইয়া থাকে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতিও অনুরূপ শ্রদ্ধা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়, দ্বিতীয়তঃ অধ্যায়ক'লে ছাত্রদের মধ্যে শিষ্টাচার, দানশীলতা, সহনশীলাত,

আশুতোষ কলেজ সমাচার

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ২৯, ৩০ ও ৩১শে মার্চ, ১৯৭৬ আমাদের কলেজ হলে 'ইণ্ডিয়ান পাওয়ার লিফটিং ফেডারেশন' আয়োজিত ও আশুতোষ কলেজ ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ও শ্যামাপ্রসাদ ব্যায়ামাগারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ফাষ্ট ন্যাশনাল পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়ন শিপ-এ আমাদের ব্যায়ামাগারের সভ্য শ্রীসমর চন্দ্র (বাংলার অধিনায়ক) হেভিওয়েট বিভাগে প্রথম শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাস, মিড্‌ল্ হেভিওয়েট বিভাগে তৃতীয় এবং শ্রীবাসুদেব কুণ্ডু মিড্‌ল্ ওয়েট বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে কলেজ তথা ব্যায়ামাগারের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় বাংলা দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়। এ ছাড়া শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায় জুনিয়র ভারতশ্রী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন।

আমাদের ব্যায়ামাগারের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীব্রজবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইণ্ডিয়ান পাওয়ার লিফটিং ফেডারেশনের সহ সভাপতি ও ফাষ্ট ন্যাশনালে প্রধান বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করায় আমরা গর্বিত। আমরা ব্যায়ামাগারের আরো সাফল্য আশা করি। গত কয়েক মাসের সাফল্যের খতিয়ান :-

১। কলকাতা পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়ানশিপ ১৯৭৫ :—

সমর চন্দ্র হেভি ওয়েট	প্রথম
বাসুদেব কুণ্ডু লাইট ওয়েট	তৃতীয়
দেবব্রত পাল ব্যান্টাম ওয়েট	তৃতীয়

২। পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়ন শিপ মার্চ ১৯৭৬ :—

সমর চন্দ্র হেভিওয়েট	প্রথম
বাসুদেব কুণ্ডু মিডল ওয়েট	ঐ
শ্যামল মজুমদার লাইট ওয়েট	তৃতীয়
দেবব্রত পাল ব্যান্টম ওয়েট	ঐ

৩। দলগত চ্যাম্পিয়ন :—

শ্যামল মজুমদার 'বঙ্গবীর'	মধ্য বিভাগ প্রথম
চঞ্চল মণ্ডল 'আলিপুরশ্রী'	তৃতীয়
ঢাকুরিয়া মাস্‌ল কনটেষ্ট	দ্বিতীয়
দেবব্রত পাল 'নেতাজী শ্রী' মাস্‌ল্‌ম্যান	ঐ

পরে অধ্যাপক শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায় .সেটি স্তব্ধ হয়ে আছে। একে আবার সচল করার কথা ভাবা হচ্ছে। এটি মোটেই কলেজের নির্দিষ্ট কোনো বিভাগীয় সংস্থা নয়। রবীন্দ্র সাহিত্য ছাড়াও, বাংলায় নানাবিধ বক্তৃতা ও কথিকা পাঠের প্রশস্ত সুযোগ এতে থাকবে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস এসবের মত চলিষ্ণু বিষয়ের কত নিত্যনূতন আবিক্রিয়া ও মনন বাইরের জগতে চলেছে অথচ আশুতোষ কলেজের মত একটি প্রথম সারির বিদ্যায়তন তার চর্চা ও অনুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা অশোভন, এটি সংগঠনের জন্য সকলের সাগ্রহ যোগাযোগ কাম্য। স্মর্তব্য অধ্যাপক গোপাল ত্রিবেদী [অর্থনীতি] মহাশয় বছরের শুরুতে অর্থনীতি বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা দেন ও কলেজের এই বক্তৃতা সভায় নানা বিভাগীয় অধ্যাপক (অন্য কলেজেরও) উপস্থিত থেকে এটি উপভোগ করেন। রবীন্দ্র পাঠ চক্রের গঠন ইত্যাদি বিষয়ে পরে জানানো হবে।

অধ্যাপক কেশব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় কলেজের কালীঘাট রোডস্থ ছাত্রাবাসে গত বছরের শীতের একটি সন্ধ্যা কাটানো গেছে গানে আবৃত্তি আলোচনায়। কলেজের আবাসিক ছাত্ররা অনুষ্ঠানটিকে মনোগ্রাহী করে তোলে। অধ্যক্ষ দুলালবাবু, অধ্যাপক পরিমলবাবু এঁরা ছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণলালবাবু এবং চিত্রাভিনেতা প্রশান্তকুমার রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে আনন্দ দেন।

এ বছরের (১৯৭৮) কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে, বিশেষত ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের স্নাতকের বার্ষিক ফলাফল খুবই ভাল হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য কলেজ কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত না হলে এবং প্রয়োজনমত ক্লাস বলতে থাকলে ফলাফল ভাল করার আরো সুযোগ থাকত। অধ্যাপকবৃন্দ এ ক্ষতিপূরণের জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন।

যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে, সেই কর্মই সৎকর্ম। কিন্তু তারা জানে এ কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস।

—শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

তোমার কান্না শুনেছি তাই।

কলেজ পত্রিকা : ১৩৬১ : 'তোমার কান্না শুনেছি' তুষার চট্টোপাধ্যায়
(প্রাক্তন ছাত্র)

৩

শিল্পীর জীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের অসীম ব্যবধান
সেখানে প্রতিটি তরঙ্গের যুক্তিসহ সংজ্ঞার্থ খোঁজো
তার অতীত কে জানো, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে
সচেতন হও। মামবিকতার গহন আলো থেকে যে
মমতাময় চেতনার জন্ম, ভেবে দেখো তা শুধু দুর্বলের
জীবন যাপনের উপায় কিনা। সত্য অর্থে যখন অসংখ্য
অণু বিস্তীর্ণ দেশ ব্যতীত আর কিছুই নেই তখন
স্নেহ ভালবাসা প্রীতির কী মূল্য।

জার্নাল : আলোক সরকার : প্রাক্তন ছাত্র : ১৯৬১ :
কলেজ পত্রিকা

৪

হে বরেণ্য দেশপূজ্য নেতা মহীয়ান;
সমগ্র ভারতবাসী শোকে ম্রিয়মাণ।
অবিরল অশ্রুধারা ঝরিছে নয়নে,
আকস্মিক মর্মন্তুদ তব তিরোধানে।
বাস্তুহারা দিশাহারা সর্বহারা দল,
কাহার উৎসাহ বাক্যে লভি মনোবল
আশ্বস্ত হইবে আজি? হে বিদ্রোহী বীর
তব পাশে ঋণবদ্ধ থাকিবে কাশ্মীর।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে : অধ্যাপক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :
কলেজ পত্রিকা : ১৩৬১ ॥

———

॥ সাধারন সম্পাদকের কলমে ॥

আমাকে যখন এই কলেজের সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হল, তখন আমি সত্যিই ভীষন ভয় পেয়ে গেছিলাম। কারণ তখন আমার মনে একটাই প্রশ্ন ছিল, এই বিরাট কলেজে আমি আমার দায়িত্ব ঠিক মত পালন করতে পারবো তো? বিশেষ করে বিগত দুই তিন বৎসর ছাত্র পরিষদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যে ভাবে ছাত্র স্বার্থে কলেজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরে বিপুল ছাত্র সমর্থন ও সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার সেই ভয়কে দূর করেছে, তবে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কলেজ Magazine দেরীতে প্রকাশের জন্য। এর জন্য দায়ী অবশ্য প্রথমত ছাত্রীদের লেখা বারবার চাওয়া সত্বেও দেরীতে পেয়েছি এবং দ্বিতীয়ত প্রেস দেরী করে আমাদের Magazine দিল।

যাই হোক কলেজের অন্যান্য কাজগুলি যথাসাধ্য ভালভাবে করার চেষ্টা করেছি। জানি না কতটা সফল হয়েছি সেটা আপনারই ভাল ব'লতে পারবেন। এবার কলেজের 'নবীন বরন উৎসব" অন্যান্য বারের মত সঙ্গীতানুষ্ঠানে না করে "নান্দীকারে"এর আন্তোগানে" মঞ্চস্থ করে নতুনত্ব করবার চেষ্টা করেছি। অন্যান্য বারের মত স্পোর্টস্‌ও ভালভাবে করেছি। প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু উন্নতি বোধ হয় ক'রতে পেরেছি। আবার কিছু কিছু কাজও ক'রতে পারিনি বিশেষ করে Botany (Hons) জায়গার অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। আমি চেষ্টা করেছি কলেজকে সবদিক দিয়েই দক্ষিণ কলিকাতা কেন তামাম পশ্চিম বাংলার সেরা কলেজে পরিণত হতে সাহায্য করতে। এবারে খেলাধূলায় অনেক কিছুতেই পটু আমাদের কলেজ পুরস্কার পেয়েছে। আমি আশা করি যেন আগামী নেতৃত্ব এই কলেজের উন্নতির পথকে সচল রাখেন। সকল ছাত্রবন্ধুদের কাছেও আমার এই আশা। পরিশেষে বলতে চাই, এই পত্রিকাকে চেয়েছি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে, জানি না কতটুকু সফল হয়েছি? শুধু ছাত্রীবন্ধুরাই তার বিচার ক'রবেন। ধন্যবাদ জানাই অধ্যক্ষ ও সহ অধ্যক্ষ শ্রীনীরোদ ভট্টাচার্য্য ও দুলাল কুমার মিত্র এবং অধ্যাপক শ্রীঅজয় সেনকে ও শ্রীবিশ্বনাথ দত্তকে যাদের আশীর্বাদ ও সহানুভূতি পেয়ে সব কাজ করতে পেরেছি। অভিনন্দন জানাই আমার কার্যকরী সভাপতি শ্রীসোমনাথ বসুকে, যার বুদ্ধি ও উপদেশ সর্বদাই আমাকে সাহায্য করেছে সবশেষে ধন্যবাদ জানাই ছাত্রবন্ধুদের যারা সব সময় আমার সমস্ত কাজে আমার পাশে থেকেছে।

জয় হিন্দ—

দেশপ্রেমিক অভিনন্দনসহ—

শ্রীপন্টু দেবরায়

সাধারন সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ